বিজ্ঞাপন

পরম্পরা

নুরুল আলম চৌধুরী - খালেদা বেগম কল্যাণ ট্রাস্ট

পরম্পরা

নুরুল আলম চৌধুরী - খালেদা বেগম কল্যাণ ট্রাস্ট

পরম্পরা

নুরুল আলম চৌধুরী – খালেদা বেগম কল্যাণ ট্রাস্ট
কদলপুর, রাউজান, চট্টগ্রাম

পরম্পরা

নুরুল আলম চৌধুরী - খালেদা বেগম কল্যাণ ট্রাস্ট

প্রকাশকাল

২০২২ খ্রিস্টাব্দ

প্রকাশক

নুরুল আলম চৌধুরী - খালেদা বেগম কল্যাণ ট্রাস্ট

প্রচ্ছদ, ডিজাইন ও মুদ্রণঃ

adfair design & supply
Tell: 01713014933, 9553163, 7117897
www.adfairbd.com



মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী
সভাপতি

সভাপতির বক্তব্য

নুরুল আলম চৌধুরী- খালেদা বেগম কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক পারিবারিক ঐতিহ্য ও গ্রামের স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য একটি স্মরণিকা প্রকাশের উদ্দ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত রাউজান উপজেলার কদলপুর গ্রামের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে এ ট্রাস্ট দীর্ঘদিন যাবত কাজ করে যাচ্ছে। এ ট্রাস্ট বিভিন্ন মানব কল্যাণমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে এ গ্রামের মানুষের চিকিৎসা, শিক্ষা, বাসস্থান, যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন, বেকার সমস্যা নিরসন ও দারিদ্র বিমোচনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

এ গ্রামে অবস্থিত ফতেহ আলী চৌধুরী বাড়ি একটি ঐতিহ্যবাহী বাড়ি। এ বাড়িতে জন্ম নিয়েছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা, জমিদার, জনপ্রতিনিধি, সমাজসেবক, শিক্ষানুরাগী, শিক্ষক ও উচ্চ পদস্থ সরকারী/বেসরকারী কর্মকর্তা। এ বাড়ির শ্রদ্ধেয় পূর্ব-পুরুষগণ এলাকার মানুষের কল্যাণে নির্মাণ করেছেন মসজিদ, স্কুল-মাদ্রাসা, চিকিৎসা কেন্দ্র, সুবিশাল দিঘী-পুকুর, রাস্তা-ঘাট, কবর স্থান ইত্যাদি। যা কালের স্বাক্ষী হয়ে আজো এ গ্রামের মাটি ও মানুষের সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকা রেখে তাঁদের অবদানকে চির স্মরণীয় করে রেখেছে।

আমার সৌভাগ্য এ বাড়িতেই আমার জন্ম। পারিবারিক ঐতিহ্য ধারণ করে পূর্ব-পুরুষগণের অবদান, মহানুভবতা ও কৃতিত্ব শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে ভবিষ্যত প্রজন্মের সাথে একটি সেতুবন্ধন তৈরি করা ও অতীত ঐতিহ্য অব্যাহত রাখা আমাদের লক্ষ্য। মানব সেবামূলক কার্যসমূহ সাংগঠনিকভাবে সুষ্ঠু ও সুন্দররূপে রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালনা, উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে একটি প্লাটফর্ম হিসেবে ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে এ ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে। এ ট্রাস্ট এর কার্যক্রম বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অতীত ঐতিহ্য সমুন্নত রাখার তাগিদে সামাজিক দায়বদ্ধতায় আবদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করবে বলে আমার বিশ্বাস।

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
সভাপতি
নুরুল আলম চৌধুরী - খালেদা বেগম কল্যাণ ট্রাস্ট



মু. মোহসিন চৌধুরী
সহ-সভাপতি

সহ-সভাপতির বক্তব্য

'নুরুল আলম চৌধুরী- খালেদা বেগম কল্যাণ ট্রাস্ট' এর বর্তমান কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরা এবং পারিবারিক ঐতিহ্য ও গ্রামের স্মৃতিকে যতটুকু সম্ভব একটি এলবামে ধরে রাখার জন্য একটি স্মরণিকা প্রকাশের উদ্দ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এ ট্রাস্ট একটি অরাজনৈতিক, অলাভজনক, অসাম্প্রদায়িক সেবাধর্মী ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান। ট্রাস্টের কর্ম-এলাকা সমগ্র বাংলাদেশ। তবে প্রাথমিকভাবে চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলার ভৌগলিক ও প্রশাসনিক এলাকায় এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে এ ট্রাস্ট দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ট্রাস্টের বর্তমান কর্ম-এলাকার উত্তম স্বভাব চরিত্রের অসচ্ছল ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের এককালীন/মাসিক আর্থিক সহায়তা, অস্বচ্ছল পরিবারকে গৃহ নির্মাণ, চিকিৎসা-মেয়ের বিয়ের জন্য আর্থিক সহায়তা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শৌচাগার নির্মাণ, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা ও শিক্ষা উপকরণ প্রদান, করোনাকালীন খাদ্য সহায়তা, অস্বচ্ছল পরিবারে প্রতিবছর ইফতার সামগ্রী বিতরণ, মডেল ফার্মেসী স্থাপনের মাধ্যমে সূলভ মূল্যে মানসম্পন্ন ঔষধ সরবরাহ, অবৈতনিকভাবে নুরানী মাদ্রাসা ও হেফজখানা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ট্রাস্টের উদ্দ্যোগে এলাকায় একটি চক্ষু চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন ও একটি এতিমখানা ভবন নির্মাণ কাজের স্থান/জমি বরাদ্দের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

ট্রাস্টের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী'র সুযোগ্য নেতৃত্বে এলাকার শিক্ষা, যোগাযোগ, বাসস্থান ও স্বাস্থ্যখাতে অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া তিনি বেকার সমস্যা নিরসন, কর্মসংস্থান, বৃক্ষরোপন ও পরিবেশ উন্নয়নে অবদান রেখে চলেছেন।

বর্তমান কার্যক্রম অব্যাহত রাখার পাশাপাশি এলাকায় একটি পাঠাগার স্থাপন, প্রবীণ নিবাস স্থাপন ও পরিচালনা, কারিগরি শিক্ষা, খেলাধুলা, তথ্য প্রযুক্তি সেবা, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী ও মানব কল্যাণে অবদানের জন্য ব্যক্তিদের সংবর্ধনা, পূর্ব-পুরুষদের আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনায় ট্রাস্টের উদ্দ্যেগে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে।

গ্রামই এদেশের প্রাণ। পূর্ব-পুরুষদের অনুসরণে গ্রামের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই ট্রাস্ট এর প্রতিটি সদস্য কাজ করে যাবে এটি আমার প্রত্যাশা।

(মু. মোহসিন চৌধুরী)
সহ-সভাপতি
নুরুল আলম চৌধুরী - খালেদা বেগম কল্যাণ ট্রাস্ট

উৎসর্গ

১. মরহুম ওবায়েদুল্লাহ চৌধুরী	মৃত্যু সন: ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ
২. মরহুম গনি মিয়া চৌধুরী	মৃত্যু সন: ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ
৩. মরহুমা হাজেরা খাতুন, স্বামী: মরহুম ওবায়েদুল্লাহ চৌধুরী	মৃত্যু সন: ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ
৪. মরহুম ছফদর হোসাইন চৌধুরী	মৃত্যু সন: ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ
৫. মরহুম কায়েকোবাদ চৌধুরী	মৃত্যু সন: ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ
৬. মরহুম আলতাফ হোসেন চৌধুরী	মৃত্যু সন: ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ
৭. মরহুম আলহাজ্ব আমিনুল হক চৌধুরী	মৃত্যু সন: ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ
৮. মরহুম জাহাঙ্গীর চৌধুরী	মৃত্যু সন: ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ
৯. মরহুম সিরাজুল হক চৌধুরী	মৃত্যু সন: ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ
১০. মরহুম সালামত আলী চৌধুরী	মৃত্যু সন: ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ
১১. মরহুম ফরিদ উদ্দিন চৌধুরী	মৃত্যু সন: ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ
১২. মরহুম সুলতান আহমদ চৌধুরী	মৃত্যু সন: ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ
১৩. মরহুম ফজল হক চৌধুরী	মৃত্যু সন: ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ
১৪. মরহুম এমদাদ হোসেন চৌধুরী	মৃত্যু সন: ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ
১৫. মরহুম মোজাফর হোসেন চৌধুরী	মৃত্যু সন: ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ
১৬. মরহুম আবুল খায়ের চৌধুরী	মৃত্যু সন: ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ
১৭. মরহুমা আয়েশা খাতুন, স্বামী: মরহুম ফজলুল হক চৌধুরী	মৃত্যু সন: ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ
১৮. মরহুম আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী	মৃত্যু সন: ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ
১৯. মরহুমা মোস্তাফা খাতুন, স্বামী: মরহুম আলহাজ্ব আমিনুল হক চৌধুরী	মৃত্যু সন: ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ
২০. মরহুম ইদ্রিস মিয়া চৌধুরী	মৃত্যু সন: ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ
২১. মরহুম বোরহান উদ্দিন চৌধুরী	মৃত্যু সন: ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ
২২. মরহুম শফিক উদ্দিন চৌধুরী	মৃত্যু সন: ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ
২৩. মরহুম শাহ আলম চৌধুরী	মৃত্যু সন: ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ
২৪. মরহুমা নূর নাহার বেগম, স্বামী: মরহুম আবুল খায়ের চৌধুরী	মৃত্যু সন: ২০০০ খ্রিস্টাব্দ
২৫. মরহুমা গুল নাহার বেগম, স্বামী: মরহুম এমদাদ হোসেন চৌধুরী	মৃত্যু সন: ২০০০ খ্রিস্টাব্দ
২৬. মরহুমা আয়েশা খাতুন, স্বামী: মরহুম কায়েকোবাদ চৌধুরী	মৃত্যু সন: ২০০০ খ্রিস্টাব্দ
২৭. মরহুম বদিউল আলম চৌধুরী	মৃত্যু সন: ২০০১ খ্রিস্টাব্দ
২৮. মরহুমা আশা খাতুন, স্বামী: মরহুম সালামত আলী চৌধুরী	মৃত্যু সন: ২০০১ খ্রিস্টাব্দ
২৯. মরহুমা নূর জাহান বেগম, স্বামী: মরহুম ছফদর হোসেন চৌধুরী	মৃত্যু সন: ২০০০ খ্রিস্টাব্দ
৩০. মরহুম হারুনুর রশীদ চৌধুরী	মৃত্যু সন: ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ
৩১. মরহুম জালাল উদ্দিন চৌধুরী	মৃত্যু সন: ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ
৩২. মরহুমা খালেদা বেগম, স্বামী: মরহুম নুরুল আলম চৌধুরী	মৃত্যু সন: ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ
৩৩. মরহুম নুরুল আলম চৌধুরী	মৃত্যু সন: ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ
৩৪. মরহুম মাহবুবল আলম চৌধুরী	মৃত্যু সন: ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ
৩৫. মরহুম ইলিয়াছ মিয়া চৌধুরী	মৃত্যু সন: ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ
৩৬. মরহুমা নাজমুন নাহার পলি, স্বামী: মো: ইউছুপ চৌধুরী	মৃত্যু সন: ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
৩৭. মরহুম আবু তাহের চৌধুরী টিপু	মৃত্যু সন: ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
৩৮. মরহুম আবু তৈয়ব চৌধুরী	মৃত্যু সন: ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

পরিচালনা পরিষদ

নুরুল আলম চৌধুরী – খালেদা বেগম কল্যাণ ট্রাস্ট



মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী
সভাপতি



মুঃ মোহসিন চৌধুরী
সহ-সভাপতি



আবুল মনসুর চৌধুরী
সদস্য-সচিব



মোঃ খোরশেদুল আলম চৌধুরী
কোষাধ্যক্ষ



অধ্যক্ষ মোহাম্মদ মোজাহেদুল ইসলাম চৌধুরী
সদস্য



হাফেজ মোহাম্মদ আবু জাফর ছিদ্দিকী
অধ্যক্ষ ও সচিব, কদলপুর হামিদিয়া ফাযিল ডিগ্রী মাদরাসা
সদস্য (পদাধিকার বলে)



মোহাম্মদ ওমর ফারুক
অধ্যক্ষ, কদলপুর স্কুল এন্ড কলেজ
সদস্য (পদাধিকার বলে)

সূচিপত্র

আমার গৌরবময় নানা বাড়ি ০৯
মঈন উদ্দিন খাঁন মইনু

স্মৃতির মনিকোঠায় ১৩
ফতেহ আলী চৌধুরী বাড়ী

স্বাধীনতা যুদ্ধে কদলপুর হাই স্কুলের মুক্তিযোদ্ধা ১৫
মোঃ মোজাম্মেল হক চৌধুরী

আমার স্মৃতির আয়নায় নানাবাড়ি ফতেহ আলি চৌধুরী বাড়ি, কদলপুর ১৮
এস.খালিদ খান (বাচ্চু)

স্মৃতিময় নানার বাড়ী কদলপুর ২০
অধ্যাপক মোহাম্মদ রায়হান উদ্দিন খান

আমার দেখা আমার গ্রাম কদলপুর ২৩
এস এম ইউসুফ

স্মৃতিপটে নানাবাড়ি ২৫
খালেদা বেগম চৌধুরী

আমার বাড়িতে, আমার স্মৃতি ২৬
মোঃ মনিরুল হক চৌধুরী

কদলপুরের কথামালা ৩১
প্রফেসর মোঃ আখতার আলম চৌধুরী

নুরুল আলম চৌধুরী খালেদা বেগম কল্যাণ ট্রাষ্ট - কদলপুরের দিগন্তে জনকল্যাণের নব সূর্যোদয় ৩৫
অধ্যাপক বাদল কিশোর দাশ

কদলপুর হামিদিয়া মাদ্রাসার ইতিবৃত্ত ৩৮
অধ্যক্ষ মাওলানা জহুর আহাম্মদ

পরিকল্পিত ছাত্র জীবনের রূপরেখা ৪০
অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী চৌধুরী

নন্দিত বি.সি.এস. পরিবার ও কল্যাণ ট্রাস্টের অন্তর্নিহীত ভাবনা ৪৪
সাধন কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক

কদলপুরে ঐতিহ্যবাহী স্বরণীয় পরিবার ৪৬
হাফেজ মোহাম্মদ আবু জাফর ছিদ্দিকী, অধ্যক্ষ ও সচিব, কদলপুর হামিদিয়া ফাযিল ডিগ্রী মাদ্রাসা

কদলপুর ইউনিয়নের শিক্ষা ব্যবস্থা ৪৯
নিজাম উদ্দীন আহমদ চৌধুরী, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অবঃ), অগ্রণী ব্যাংক লিঃ

আমাদের কদলপুর স্কুল এন্ড কলেজ ৫৩
মোহাম্মদ ওমর ফারুক, অধ্যক্ষ, কদলপুর স্কুল এন্ড কলেজ

হাজী অমিনুল হক চৌধুরী : স্বপ্নের বাতিঘর ৫৫
রফিক উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী

ঐতিহ্য ফিরে দেখা-ফতেহ আলী চৌধুরী বাড়ী ৬৩
মো: খোরশেদুল আলম চৌধুরী

স্মৃতির শৈশব ও কদলপুর হামিদিয়া মাদরাসা ৬৬
অধ্যাপক মোজাহেদুল ইসলাম চৌধুরী

এক নজরে কদলপুর ইউনিয়ন ৭২

চট্টগ্রামের বিখ্যাত মুসলিম পরিবার ৭৫

স্মৃতিময় আম্মার নানা বাড়ি কদলপুর ৭৭
কাজী মাহতাব উদ্দীন (আজাদ)

আমার বাড়িতে, আমার স্মৃতি ৭৮
মো: মনিরুল হক চৌধুরী

নুরুল আলম চৌধুরী - খালেদা বেগম কল্যাণ ট্রাস্ট দলিল ৮৩

জ্ঞান-শিক্ষা, মানবিক মুল্যবোধ ও আচার-আচরণ ৯৫
এডভোকেট কাজী মুহাম্মদ নজমূল হক

কদলপুর, রাউজান ম্যাপ

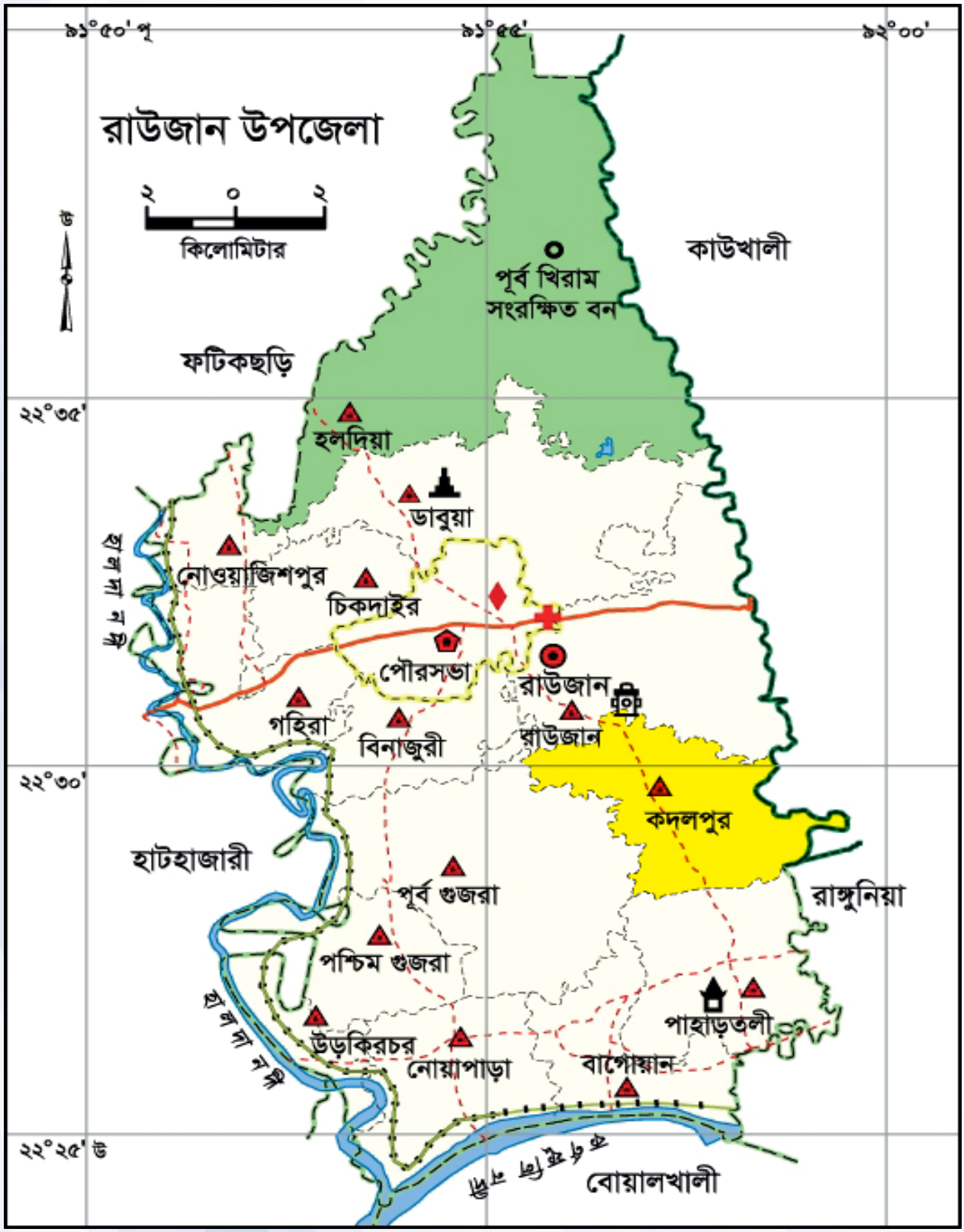



আমার গৌরবময় নানা বাড়ি

মঈন উদ্দিন খাঁন মইনু

ফতেহ্ আলী চৌং বাড়ি। চট্টগ্রামের রাউজান থানার অন্তর্গত কদলপুর গ্রামে অবস্থিত আমার এই নানা বাড়ি।

আমার নানা মরহুম সুলতান আহমদ চৌং বৃটিশ যুগের জুরি বোর্ডের মেম্বার ছিলেন। তিনি মোকতারশিপের উপর লেখাপড়া করেছিলেন বলে আইনী বিষয়ে ভাল বুঝতেন। এমনকি বিচারকেরাও কোন কোন সময় রায় দেয়ার আগে নানার পরামর্শ নিতেন বলে জনশ্রুতি আছে। নানা জমিদার ছিলেন এবং তার জমিদারি সুদূর রাংগামাঠিয়া, ভুজপুর, ফকিরটিলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। খাজনার জন্য ঘোড়ায় চড়ে এবং পালকিতে চড়ে এ সব এলাকায় যেতেন। তিনি একজন প্রজা হিতৈষী জমিদার হিসাবে সবাই থাকে পছন্দ করত। তদানিন্তন বৃটিশ সরকার আমার নানাকে সিতারা-ই-কেতাব উপাধিতে ভূষিত করে ছিলেন। আমার নানার পিতার নাম আশরফ আলী চৌং তিনি ওখানে একটি হাট বসান যেটা আশরফ আলী চৌং হাট নামে পরিচিত।

আমার নানির বাবা ফটিকছড়ি ফতেহ্ আলি মুনসী বাড়ির জনাব আবদুস সোবহান চট্টগ্রাম আদালতে একজন Translator হিসাবে কাজ করেন। নানির ভাই তাহের মিয়া Post Master General (PMG) ছিলেন। নানির বড় বোন হল তৎ কালের বিশিষ্ট শিল্পপতি মির্জাবু আহমদের মা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এর সাবেক ভি সি অধ্যাপক মোহাম্মদ আলি আমার নানির ভাতিজি জামাই। আবার ঐ ভাতিজিও একই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ছিলেন যার নাম ড. খালেদা হানুম। সম্প্রতি তারা দুজনই মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে ইন্তেকাল করেন।

আমার নানার তিন ছেলে ও দুই মেয়ে। বড় ছেলে মরহুম বদিউল আলম চৌং ১৯৩৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে অর্থনীতিতে অনার্স করেন। বৃটিশ সরকারের কর্মকর্তা হিসাবে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। দেশ বিভাগ হলে তিনি পাকিস্তান সরকারের Audit & Accounts বিভাগে নিয়োগ পান। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার কয়েক বছর পর তিনি CAO হিসাবে অবসর নেন। তিনি ইংরেজি শিক্ষিত হলেও আরবিতে ও খুব পারদর্শী ছিলেন। ঢাকার লালমাটিয়া হাউজিং সোসাইটিতে নিজ ক্রয়কৃত জমিতে বাড়ি করলেও নিয়মিত গ্রামে আসতেন। সারাদিন মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল পরিচালনায় তার সময় কাটত। গ্রামের মানুষ তাকে খুব সম্মান করত। উনার ঢাকার বাসা ছিল চট্টগ্রামের আত্মীয় স্বজনদের আশ্রয় স্থল। এদের অনেকেই উনার লালমাটিয়ার বাসায় থেকে ঢাকায় চাকুরি জোগাড় করত এবং লেখাপড়াও করত। ছোট্ট বাসায় মামীর খুব কষ্ট হলেও এতে মামার সাথে কোন দিন দ্বিমত করেনি। ভাল মন্দ যখন যা থাকত তাই দিয়ে সবাইকে তৃপ্ত করাতেন। আমার বড় মামার মত এ রকম পরোপকারি লোক আজকের সমাজে বিরল। মামার আরেকটা বড় গুন ছিল নারী শিক্ষা প্রসারে। তিনি আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবদের মেয়েদেরকে উচ্চ শিক্ষা লাভে উৎসাহ দিতেন। তাই নিজের মেয়েকে ও উনি শিক্ষক ও ডাক্তার বানিয়েছেন। তিনে নিতান্তই সহজ সরল এবং ধর্মভীরু ছিলেন। আমার এই বড় মামা ঢাকার লালমাটিয়া কেন্দ্রীয় মসজিদের সেক্রেটারি ছিলেন। সততার উজ্জল দৃষ্টান্ত রেখে যাওয়া আমার মামাকে মুসলিরা এখনও স্মরণ করেন।

উনার দুই ছেলের মধ্যে বড় ছেলে জনাব ওয়াহিদুল আলম চৌং বাবুল ভাই BUET থেকে Architectual Engineering এ First Class 1st হয়ে BUET এ অধ্যাপনায় যোগদেন। Assistant Professor থাকাকালীন তিনে আমেরিকায় যান আরও উচ্চতর ডিগ্রীর

জন্য এবং পরে সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। ছোট ছেলে শহীদুল আলম চৌং বুলু বাংলাদেশ টেলিভিশন এর Senior Engineer হিসাবে অবসরে গেছেন। তিনি চাকুরীকালীন সময়ে BTV র পক্ষ থেকে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এরশাদ সাহেবের সফর সঙ্গী হিসেবে বিভিন্ন দেশ সফর করেন। দুই মেয়ের মধ্যে বড় মেয়ে বেবি আপা লালমাটিয়া গালর্স স্কুলের সিনিয়র শিক্ষক ছিলেন এবং উনার স্বামী পানি উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালক হিসাবে অবসর নেন। ছোট মেয়ে রুমু আপা সিংগাপুর, মালয়েশিয়া ও ব্রুনেই তে সরকারী ডাক্তার হিসাবে বহুদিন কাজ করেছেন। উল্লেখ্য তিনি ব্রুনেই সুলতানের পারিবারিক ডাক্তার হিসাবেও কাজ করেছেন। ব্রুনাই সরকারের হজ্ব ডেলিগেশনের ও উনি Medical Team এর প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। উনার স্বামী BUET থেকে Civil Engineer পাশ করেন এবং সিঙ্গাপুর সরকারের অধীনে কাজ করেন। বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ায় স্বামী, ছেলে-মেয়েদের সাথে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।

নানার মেজ ছেলে মানে আমার মেজ মামা মৌলভী নুরুল আলম চৌং একজন নিবেদিত স্কুল শিক্ষক ছিলেন। তিনি বাংলা অংক ইংরেজি ও আরবিতে খুব পারদর্শী ছিলেন। একজন আদর্শবাদী শিক্ষক হিসাবে তার খুব নাম ছিল। আমি যখন শহরের কলেজে ভর্তি হই তখন আমি মাঝে মধ্যে উনার কাছে যেতাম। তিনি আমাকে দশ বিশ টাকা দিতেন। আমি খুব খুশী হতাম। তখনকার দিনে দশ টাকায় থলে ভরে বাজার হত। ভাগিনা দের খুব ভালবাসতেন। মামা সোজা শান্ত ও ধর্ম প্রিয় লোক ছিলেন। আমার মেজ মামি ছিলেন খুব পরিশ্রমী, মেধাবী ও কঠোর শাসনের মানুষ। ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া, আদর্শ জীবন গঠনের ব্যাপারে মামী কঠোর হলেও তার মনটা ছিল দিল দরাজ। আত্মীয় স্বজনদের খোঁজ খবর রাখা ও খাওয়াতে খুব পছন্দ করত। এ মেজ মামী আমাদের সকলের কাছে খুব প্রিয় ছিলেন। তিনি রত্নগর্ভা মা হিসাবে পরিচিত।

এ মেজ মামার বড় ছেলে মুসলিম চৌধুরী চট্টগ্রাম সরকারি কমার্স কলেজ হতে ইন্টার এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে একাউন্টিং এ কৃতিত্বের সাথে অনার্স-মাষ্টার্স করার পর পূবালী ব্যাংকে ১ম গ্রেডের অফিসার হিসাবে নিয়োগ পায়। পরবর্তীতে BCS উত্তীর্ণ হয়ে সরকারি ক্যাডার সার্ভিসে AAG পদে যোগদান করে। পদোন্নতির ধারায় যথাক্রমে উপ সচিব, যুগ্ম সচিব, অতিরিক্ত সচিব ও সর্বোচ্চ ধাপ অর্থ সচিব পদে সফলতার সাথে অবসর গ্রহন করে। অর্থ ব্যবস্থাপনায় যুগান্তকারী সংস্কার আনায় তাকে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জনপ্রশাসন পদকে ভূষিত করা হয়। সে সার্ক উন্নয়ন তহবিলের ডাইরেক্টর এবং ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (IDB) এর ভাইস চেয়ারম্যান হিসাবে ও দায়িত্ব পালন করে। এ ছাড়া বাংলাদেশ বিমান, ইষ্টার্ন রিফাইনারী, সোনালী ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক এর সরকার মনোনীত ডাইরেক্টর হিসাবে ও কাজ করে। সে ইংল্যান্ডের বিখ্যাত বার্মিংহাম ইউনিভার্সিটি থেকে ডিস্টিংশন সহ ফাইনান্সে মাষ্টার্স ডিগ্রী অর্জন করে। অর্থসচিব হিসাবে অবসর গ্রহনের পর বাংলাদেশ সরকার তাকে সাংবিধানিক পদে CAG (Comptroller & Auditor General) পাঁচ বছরের জন্য নিয়োগ দান করে। সম্প্রতি গঠিত নির্বাচন কমিশন সংক্রান্ত পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট সার্চ কমিটির সে অন্যতম সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করে। লক্ষ লক্ষ সরকারি চাকুরীজীবি ও পেনশনারদের জন্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে ডাটাবেস পদ্ধতির উদ্ভাবক এই মুসলিম। দীর্ঘদিনের পেনশনারদের অবর্ননীয় কষ্টের অবসানে তার ভুমিকা ইতিহাস হয়ে থাকবে। সে আমেরিকা, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিন পূর্ব এশিয়ার বহু দেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ফোরাম / সেমিনার / কনফারেন্স ইত্যাদিতে অংশ গ্রহন করে বাংলাদেশের সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধি করে। আমার নানা হজে যাওয়ার সময় মুসলিম নাকি মামীর গর্ভে ছিল। নানা নাকি আল্লাহ্ কাছে আরজি পেশ করেছিল যে আমার যে নাতি দুনিয়ায় আসতেছে সে যেন পুরা দুনিয়া রৌশন করতে পারে। কি অসাধারণ। আলাহ্ আমার নেকবকত নানার দোয়া কবুল করেছেন। তার নাতি এখন দেশের গন্ডি পেরিয়ে বিদেশেও সমাদৃত। এত বড় সরকারি পদে থাকার পরও সে গ্রামকে ভুলে নি। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট, সেতু কোথায় নাই তার অবদান। নিজেদের বাড়িকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভরা পুকুর, দিঘি, লেক, বাগান, গাছপালা বেষ্টিত মুগ্ধ করার মত এক স্বপ্নীল সবুজ পরিবেশ গড়ে তুলেছে। সপ্তাহিক ছুটি ঢাকায় না কাটিয়ে গ্রামেই কাটিয়ে দেয়। গ্রামের মানুষের কাছে সে একজন অতি কাছের মানুষ। তাই সে বলে আমার শিকড় যেখানে আমার বড় পরিচয় ও সেখানে।

মেজ ছেলে মহসিন চৌধুরী বিদ্যুৎ মন্ত্রনালয়ের অতিঃ সচিব পদে দায়িত্ব পালন করছে। সে খুব ভদ্র ও অমায়িক হিসাবে সবার কাছে গ্রহণীয়। সে সমাজের মানুষের উপকারে আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করে। পেশাগত জীবনে Magistrate, AC Land, UNO হিসাবে প্রশংসা পেয়েছে। বিদেশে সরকারি দায়িত্ব পালনেও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। হজ্ব মিশনে সরকারি দ্বায়িত্ব পালন কালে মক্কায় সে হাজ্বীদের খুব সাহায্য করত বলে হাজ্বীরা অমায়িক ব্যবহারের খুব প্রশংসা করত। প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রনালয়ে ডাইরেক্টর থাকাকালীন প্রবাসীদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণ মুলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যার জন্য প্রবাসীদের কাছে খুব প্রিয় ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে।

ছোট ছেলে মুজাহিদুল ইসলাম চৌং দারুল উলুম আলীয়া চট্টগ্রাম থেকে কামিল ডিগ্রী অর্জন করে এবং কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আল কোরান ও ইসলামীক ষ্টাডিজ বিষয়ে অনার্স মাষ্টার্স করে। পরবর্তীতে BCS (শিক্ষা) এ কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে বিভিন্ন সরকারি কলেজে অধ্যাপনা করে। বর্তমানে চট্টগ্রাম সরকারি কলেজের PRINCIPAL পদে দায়িত্ব পালন করছে। সে ইউনিয়ন ব্যাংক, ইসলামি ব্যাংক এ শরিয়াহ্ বোর্ড এর ডাইরেক্টর হিসাবে ও দায়িত্ব পালন করছে। কদলপুর হামিদিয়া মাদ্রাসা ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হিসাবে ও দায়িত্বে আছে।

মেজ মামার দু'জন মেয়ের মধ্যে বড় মেয়ে খুশি আপার আচার-আচরণ, কথা-বার্তা প্রায় মেজ মামীর মতই, আমরা যখন নানা বাড়ী যেতাম এই খুশি আপাই সব কিছু খেয়াল করতেন। ঘরভর্তি এতগুলো মানুষ আমরা, সব খুশি আপা ম্যানেজ করে নিতেন। তিনি পরিবার নিয়ে নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটির নিজস্ব ফ্লাটে বাস করেন। খুশী আপার স্বামী একটি বেসরকারী গ্রুপ অব কোং থেকে অবসর নেন। মেজ মামার ছোট মেয়ে মুক্তা SSC পাশ করার পর মেজ মামা আর পড়াতে চাচ্ছিলেন না। কিন্তু মুসলিম এতে রাজী হয় নি। সে তাকে ঢাকায় বড় মামার উৎসাহে লালমাটিয়া গার্লস কলেজে ভর্তি করিয়ে দেয়। সেখান থেকে মুক্তা HSC পাশ করে। পরে B.A. B. Ed করে শিক্ষকতায় যোগ দেয়। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসাবে সম্প্রতি অবসর নেন। মুক্তার স্বামী একাউন্টস ও অডিট বিভাগে উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা হিসাবে অবসর গ্রহন করেন।

আমার ছোট মামা ডাঃ শফিকুল আলম চৌং সরকারি মেডিক্যাল অফিসার হিসাবে রিটায়ার করেন বহু বছর আগে। তিনি চিটাগাং এর বাইরেই বেশির ভাগ চাকুরিজীবন কাটান। যেখানেই বদলি হয়ে গেছেন সেখানেই নাম কুড়িয়েছেন শুধু ভাল ডাক্তার হিসাবে নয় বরং তার সহজ সরল ব্যবহারে রোগীরা তাকে অন্তর থেকে নাকি দোয়া করত। ছোট মামিকে দেখেছি সব সময় ঘর দোর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে। এটা তার নিয়মিত একটা কাজ ছিল। ছোট মামা সরকারি ডাক্তার ছিলেন বলে দেশের বিভিন্ন জেলায় বদলি হতে হত। তাই ছোট মাম-মামি ও মামতো ভাই-বোনদেরকে খুব একটা কাছে পাইনি। ছোট মামার চার ছেলের মধ্যে বড় ছেলে এস এ এম মোকতাদিরুল আলম চৌং রাসেল একটি বেসরকারি সংস্থার পদস্থ কর্মকর্তা। মেজ ছেলে ফখরুল আলম চৌং খোকন অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ার। বিখ্যাত গাড়ী সংযোজন কারখানা উত্তরা মোটরসে সে Manager হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সেজ ছেলে দিদারুল আলম চৌং স্বপন ফেনী পলিটেকনিক কলেজের অধ্যাপক পদে নিয়োজিত আছে এবং ছোট ছেলে ইফতেখার আলম চৌং শোয়েব খুব মেধাবী, প্রকৃতি প্রেমিক এবং ভালো লেখক ও বটে। উনার একটিমাত্র মেয়ে শিরিন যাকে মাইজজা মিয়ার দ্বিতীয় ছেলে সফিকের সাথে বিয়ে দেয়া হয়। তার স্বামী এখন প্রয়াত।

আমার নানা সুলতান আহমদ চৌধুরীর ২ মেয়ের মধ্যে আমার খালা ও আমার মা।

আমার একমাত্র খালা মরহুম শাহাজাহান বেগম অত্যন্ত সহজ সরল ও নিরহংকার মহিলা ছিলেন। গরীব দুঃখীদের খাওয়াতে ভালোবাসতেন। আমাদের প্রতি তার ভালবাসা, আদর ও স্নেহ ছিল অকৃত্রিম। খালার বাড়ী গেলে আসার সময় পুটলী বেধে কত কি দিতেন। অনেক সময় নিতে না চাইলে খুব গোস্বা করতেন। খালু মরহুম হাফেজ মৌলানা আ,ন, ম, আব্দুল কাদের চৌধুরী কাপ্তাই প্রজেক্ট হাই স্কুলের হেড মৌলানা ছিলেন। তিনি একজন প্রখ্যাত আলেম ও পীরে কামেল ছিলেন। চট্টগ্রামের বাইরে সেই সুদূর কুষ্টিয়ায় ও তার অনেক মুরীদ রয়েছেন। প্রচারবিমুখ এই খালুজান খুবই আদর্শবান জীবনের অধিকারী এবং কঠোর নিয়ম শৃংখলা পালনকারি ব্যাক্তি ছিলেন। খালুজানের বাংলা - ইংরেজী হস্তাক্ষর ছিল মুক্তার মত। ছেলে মেয়েদের বার্ষিক ও বৃত্তি পরীক্ষা আসলে তিনি নিজের হাতে নোট করে দিতেন। তিনি ইংরেজী, পার্সী, আরবী, উর্দু, বাংলা ও অংকে সমান পারদর্শী ছিলেন। তার রচিত অনেক প্রবন্ধ/লেখা তখন পাকিস্তান সরকার কর্তৃক পুরস্কারে ও ভুষিত হয়েছিল বলে শুনেছি। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভুমিকা পালন করেছিলেন। শুনেছি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ৯ মাস উনি বাজার থেকে মাছ কিনে খান নাই। কেননা তখন আলবদর রাজাকারেরা হিন্দুদের পুকুরের মাছ লুট করে বাজারে বিক্রির জন্য আনত। একজন সৎ, নীতিবান ও আদর্শ জীবনের মূর্ত প্রতীক ছিলেন আমার শ্রদ্ধেয় খালুজান। এই খালা-খালুর ৫ ছেলে ও ২ মেয়ে।

বড় ছেলে মরহুম গোলাম মোস্তফা চৌধুরী মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহন করেন। তিনি ১নং সেক্টরে গ্রুপ কমান্ডার ছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি সরকারী চাকুরিতে যোগ দেন এবং খাদ্য মন্ত্রনালয়ের সিনিয়র কর্মকর্তা হিসাবে অবসর নেন। তিনি খুবই সাহসী ও প্রানবন্ত লোক ছিলেন। তিনি যেখানে যেতেন সবাইকে মাতিয়ে তুলতেন। তার গানের গলা খুবই সুন্দর ছিল, নাটক ও করতেন। আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-পড়সি সবার কাছে খুব প্রিয় মানুষে পরিনত হয়েছিলেন। দেশ স্বাধীনের পর পর তিনি আমাদের বাড়ীতে এসেছিলেন। তার ঝাকড়া চুল, গোফের বাহার এখন ও মনে পড়ে। দেখতে অনেকটা বাঘা কাদের সিদ্দিকির মত লাগত।

খালুর মেঝ ছেলে মরহুম প্রফেসর আবদুন নুর ছাত্র জীবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে কৃতিত্বের সাথে অনার্স / মাষ্টার্স করেন। ছাত্র রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন এবং সূর্য সেন হলের ভি,পি হিসাবে ও দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার হিসাবে যোগ দেন। লোক প্রশাসন বিভাগের যাত্রা তাঁর হাত দিয়ে শুরু। তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ গ্রন্থ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশ পায়। তিনি মালয়েশিয়ার মালয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম পি এ ডিগ্রী নেন। তিনি ব্রিটিশ কাউন্সিল ফেলো হিসাবে বিলাত গমন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরীকালীন সময় তিনি শামশুন্নাহার হলের প্রভোষ্ট, লোক প্রশাসন বিভাগের চেয়ারম্যান এবং ডীন হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের একজন প্রভাবশালি সদস্য ও ছিলেন। আপাদমস্তক সৌম্য দর্শন এই গুনী ভাইটি দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁকে আমরা অকালে হারালাম।

সেজ ছেলে জনাব মোঃ হারুন চৌধুরী অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন বলে শুনেছি। প্রতিটি বৃত্তি পরীক্ষায় তিনি প্রথম গ্রেডে বৃত্তি লাভ করতেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স-মাষ্টার্স করে পরে বি, সি, এস পরীক্ষায় উত্তীর্ন হয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট, জেলা প্রসাশক ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের সিনিয়র যুগ্ম সচিব পদে কৃতিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। একজন মেধাবী ও সৎ কর্মকর্তা হিসাবে তার খ্যাতি রয়েছে। তিনি পেশাগত দায়িত্বের কারণে ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার বহু দেশ সফর করেন। তিনি এখন অবসরপ্রাপ্ত। ধর্ম চর্চা ও লেখা লেখিতেই সময় কাটান।

ছোট ছেলে আব্দুল মান্নান (মানিক) সে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়ন শেষে আমেরিকায় যায় এবং সূদীর্ঘকাল সেখানে বাস করে। বর্তমানে দেশে থেকেই ব্যক্তিগত কাজ কর্মে নিয়োজিত।

সর্বকনিষ্ট ডঃ আব্দুল মাবুদ ঢাকার সরকারী আলীয়া মাদ্রাসা থেকে কামিল পাশ করে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামীক ষ্টাডিজ বিষয়ে কৃতিত্বের সাথে অনার্স মাষ্টার্স করে এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছে। ২০১৭ সালে ইংরেজীতে সে PHD অর্জন করে। উল্লেখ্য যে আমাদের আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে সেই ই প্রথম PHD ডিগ্রী অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করে। খুব ভদ্র, নম্র ও ধৈর্য্যশীল আমাদের এই ভাইটি সকলের কাছে খুবই প্রিয়।

খালা-খালুর ২ মেয়ের মধ্যে বড়জন জয়নব বুবু ঢাকায় চিকিতসা জনিত কারণে তার মেয়ের বাসায় অবস্থান করছেন। তার স্বামী PDB তে দীর্ঘদিন চাকুরী শেষে অবসর জীবন যাপন করছেন। ছোটজন খাদিজা বেগম বুলু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিষ্ট্রি বিভাগ থেকে অনার্স-মাষ্টার্স করে। সে খুবই মেধাবী ছাত্রী ছিল। প্রাইমারী, জুনিয়র এবং এস, এস, সি তেও সে ১ম গ্রেডে সরকারী বৃত্তি পেয়েছে। সে সেগুন বাগিচায় নিজস্ব ফ্ল্যাটে বাস করছে। তার স্বামী পি, ডি, বি র অবসরপ্রাপ্ত চীফ ইঞ্জিনিয়ার। আমার এই খালাত বোনটি সেই ছাত্রাবস্থায়

থেকেই স্কুল ওয়াল ম্যাগাজিনসহ অন্যান্য বার্ষীকি গুলোতেও প্রচুর লেখা দিত। তার প্রকাশিত "এলোমেলো ভাবনা" গ্রন্থটি সত্যিই মন কাড়ে। আমার অমায়িক খালাত বোনটি ও আমি প্রায় সমবয়সী।

আমার মা মরহুম রওশন জাহান আমার নানা-নানীর ছোট মেয়ে। মা খুবই ধর্মভীরু মহিলা ছিলেন। নিয়ম-শৃংখলা মেনে চলতেন। মা ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়েছেন বলে শুনেছি। তবে তার চিঠিপত্র লেখার একটা স্টাইল ছিল। নির্ভুল শব্দচয়ন দেখে মনে হয় না যে মা'র লেখাপড়া কম। অতন্ত্য ধৈর্য্যশীল ও কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন আমার মা। নামাজ-কালাম, দোয়া-দরুদ ইত্যাদি মা'র কাছ থেকে শেখা। আর্থিক টানাপোড়েন কিভাবে সামলিয়ে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাবেন সেটাই ছিল তার মূল লক্ষ্য। আমার বাবা মরহুম ইব্রাহিম খাঁন ছিলেন একজন খাঁটি ঈমানদার, সহজ-সরল চরিত্রের অধিকারী আমার বাবার কাছে শত্রু-মিত্র সবাই সমান। সংসার, ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া কিভাবে চলছে কোন কিছুই নিয়ে বাবাকে টেনশন করতে দেখি নি। খুব হাটা-চলা করতেন। খুব ভোজন রসিক লোক ছিলেন। গাল-গল্পে মেতে থাকতে পছন্দ করতেন। জীবনের শেষ পর্যন্ত্য নিশ্চিন্তে তিনি হাতে-রথে সুস্থ অবস্থায় কাটিয়েছেন।

আমরা ৫ ভাই ১ বোন।

বড় ভাই সাইফুদ্দিন খালেদ খাঁন (বাচ্চু) বিশ্ব খ্যাত সুইস্ কোম্পানী নেস্লের Commercial Director হিসাবে অবসর গ্রহন করেন। ইতিপূর্বে তিনি বৃটিশ কোং ICI এবং ফ্রেন্স কোং SKF এ Commercial Manager হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। পেশাগত কাজে বিভিন্ন দেশও সফর করেন। পরিবারে আমার বড় ভাইয়ের অবদান অনস্বীকার্য। আমাদের লেখা পড়া ভরন পোষন ইত্যাদি ব্যয় নির্বাহের জন্য উনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তার আচার আচরণ ও অমায়িক ব্যবহারের কারণে আত্মীয় স্বজনদের সবাই তাকে খুব পছন্দ করেন।

মেঝ ভাই শওকত ওসমান খাঁন ইষ্টার্ন রিফাইনারী হাই স্কুল ও কলেজের সিনিয়র ইংরেজী শিক্ষক ছিলেন। তার শিক্ষকতা জীবনে উনি অনেক সুনাম অর্জন করেন। দেশে বিদেশে তার বহু ছাত্র-ছাত্রী উচ্চ পদস্থ পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। বর্তমানে তিনি অবসর জীবন যাপন করছেন।

তারপর আমি সোনালী ব্যাংকে বছর দশেক চাকুরী করে ব্যবসায়ী হবার স্বপ্নে ইন্ডেন্টিং ফার্ম প্রতিষ্ঠা করি। ব্যবসার প্রয়োজনে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের সুযোগ লাভ করেছি। বিভিন্ন বানিজ্যিক সংগঠন যথা ঢাকাস্থ বাংলাদেশ ইন্ডেন্টিং এজেন্টস্ এসোসিয়েশনের (BIAA) ডাইরেক্টর, চট্টগ্রাম চেম্বারের এসোসিয়েট মেম্বার ও মার্চেন্টস এসোসিয়েশন জুবিলী রোড, চট্টগ্রামের সিনিয়র সহ-সভাপতি পদে দায়িত্ব পালন করার সুযোগ লাভ করেছি।

আমার ছোট ভাই জাকারিয়া খাঁন ডিভিশনাল একাউন্টস্ অফিসে অডিটর হিসাবে চাকুরী জীবন শেষে অতি সম্প্রতি অবসরে গেছে।

সবার ছোট রায়হান উদ্দিন খাঁন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসা থেকে কামিল পাশ করে এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Public Administration এ অনার্স - মাষ্টার্স করে। পরবর্তীতে বি এড ডিগ্রী অর্জন করে। সে হযরত ইয়াছিন শাহ পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজে বহুদিন অধ্যাপনা করে। বর্তমানে সিনিয়র শিক্ষক হিসাবে রাউজান মহিলা মাদ্রাসায় কর্মরত আছে। উল্লেখ্য যে সে সম্প্রতি রাউজান উপজেলায় শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত হয়।

আমাদের একমাত্র বোন ফরিদা ইয়াসমিন খানম খুকি আমার বড়। ফৌজদার হাটের ছলিমপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও প্রখ্যাত সাংবাদিক মরহুম কাজি কবির উদ্দিনের বড় ছেলে কাজি এ এন এম বদরুদ্দোজা এর সাথে বিয়ে হয়। আমার এ দুলাভাই গ্যাক্সোতে চাকরি করতেন। তিনি এখন প্রয়াত।

উল্লেখ্য যে আমার নানী চোখে কম দেখতেন কিন্তু তার ধী শক্তি ছিল প্রখর। নাতি-নাতনিরা কে কোথায় ঘুমাবে, গরুর দুধ খেয়েছে কিনা, ভাত খেয়েছে কিনা সব কিছু খোজ রাখতেন। বৃদ্ধ শাশুড়িকে নিয়ে আমার মেজ মামীর কি যে কষ্ট, এখনো ভুলিনি। মুসলিমকে দেখতাম আমার নানা-নানির জন্য রাখা আঙ্গুর-বেদানা ইত্যাদি ফল-মুল লুকিয়ে লুকিয়ে খেতে। নানা যখন দেখতেন তার নাতি মুসলিম সব খেয়ে ফেলেছে তখন খুব রাগ করতেন, আবার ভিতরে ভিতরে আনন্দ ও পেতেন। কেননা নাতি-নাতনিরা ছিল নানার কাছে খুব প্রিয়। মধুর সম্পর্ক তো বটেই।

নানা বাড়ীর উত্তর প্রান্তে জাফর বদ্দাদের উঠান থেকে দক্ষিন প্রান্তের সুন্দর নানীর উঠান পর্যন্ত আমারা ছোটা-ছুটি, দৌড়া-দৌড়ি করতাম। তবে সুন্দর নানীর পর মাইজ্যা মিয়া চেয়ারম্যান মামার উঠানে যেতে পারতাম না কেমন যেন একটা ভয় ছিল। এমনকি তাদের সামনের ঘাটায় ও যেতে ভয় লাগত। এই মাইজ্যা মিয়া মামার বড় ভাই মরহুম সফদার হোসেন চৌঃ বৃটিশ আমলে মাষ্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন এবং বৃটিশ বেঙ্গল এর Tax Commissioner ছিলেন। তার ছেলে মরহুম ফরিদ আহমদ চৌঃ প্রতিথযশা সাংবাদিক ছিলেন। তখনকার ইংরেজী পত্রিকা Pakistan Observer এর সম্পাদক থাকা অবস্থায় পেন দূর্ঘটনায় মারা যান।

আমার আরেক নানা মরহুম সিরাজুল হক চৌঃ খুবই সাহসী ছিলেন। তিনি নাতি-নাতনি দের সাথে হাসি, টাট্টা, গল্প-গুজবে মেতে থাকতেন। মনে পড়ে ডাকাতের গুলিতে এই নানা মারা যান। শাহ্ আলম মামাকে ডাকাতেরা মারতে এসেছে "তোরা কই, আমার ভাইপোর ঘরে ডাকাত ডুকেছে, তোরা আমার ভাইপোকে বাঁচা" উনার চিৎকার শুনে ডাকাতেরা উনাকে গুলি করে। এই নানার বড় ছেলে ঈদু মামা ও ছোট ছেলে ইলিয়াছ মামা অনেক দিন ইউনিয়ন মেম্বার ছিলেন। সমাজের শালিস বিচার, সামাজিক কাজে ব্যস্ত থাকতেন।

আরেক নানা মরহুম কায়কোবাদ চৌঃ তার দুই ছেলের মধ্যে শাহ্ আলম মামা ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বার ছিলেন দীর্ঘ দিন। অন্য ছেলে মাহাবুব মামা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে দীর্ঘদিন চাকুরী শেষে অবসর নেন। দুই জনই এখন প্রয়াত।

সিদিজ্জার বাপ মামার কথা মনে পড়ে। তিনি কাধে ভার বহন করে আম-কাটাল আরো কত কিছু নিয়ে আসতেন আমাদের জন্য। নানা-নানী তার নাতীদের জন্য পাঠাত আর কি। লেদন্যা বদ্দা, আব্দুস ছালাম বদ্দা এই মানুষগুলোর আন্তরিক ভালবাসা ভুলার নয়। আমরা

নানার বাড়ী গেলে এদের কাজ কর্ম অনেক বেড়ে যেত। আমাদের পাইফরমায়েশ যোগান দিতেই ব্যাস্ত থাকত।

নানা বাড়ীর হাটে পাশারির দোকানের মালিককে মামা ডাকতাম। কোন কিছু লাগলেই দৌড় দিতাম। খুব আন্তরিক ছিলেন উনি।

ছোটবেলায় মা'র সাথে নানার বাড়ি বেড়াতে যাওয়ার আনন্দ এখনো ভুলিনি। সাম্পানে বৈজজালি হয়ে কে কোরোত কে কোরোত করতে করতে যখন নানা বাড়ি কাছায় আসত তখন কি খুশী আর ধরে রাখা যায়! সাম্পান থেকে লাফ দিয়ে পড়ি যেন। স্কুল যখন লম্বা ছুটি দিত সে দিনগুলো তে আমরা, জাহানগীররা, লিলি আপারা, বুলুরা সবাই একই সময়ে নানা বাড়ি বেড়াতে যেতাম। মিলন মেলা আর কি। মা-খালারা সবাই একত্রিত হতেন, বিশেষ করে আনু খালা, মরিয়ম খালা, বড় খালা, আমার মা সবাই মিলে ভরা বাড়ী। পুকুর / দীঘির মাছ, গোয়াল ঘরের গরুর দুধ, গোলা ভরা ধান কোন কিছুরই অভাব নাই। যে দৃশ্য এখনকার যুগে ভাবাই যায় না। সেখানে আমরা ছোটদের কে নিয়ে বনভোজন হত, দিঘিপাড়ে মাছ ধরার দৃশ্য, এ ঘর সে ঘর ঘুরে বেড়ানো, জোনাকী পোকার পিছে দৌড়ানো, দেউড়ী ঘরে বসে বিভিন্ন গেম, চাদনি রাতে চোখবেধে খেলা, হাডুডুখেলা, আরো কত কি সব কি আর মনে আছে? সকালের নাস্তার জন্য গোল হয়ে বউচখানায় খেতে বসা এবং মেজ মামির হাতে বানানো শীতকালীন পিঠা, খেজুর রস এখনও মুখে যেন লেগে আছে। কি অসীম তৃপ্তি ও মায়া মমতায় ভরা সে স্মৃতিময় মুহূর্ত গুলো। কবি গুরু রবিন্দ্রনাথের সেই গানটির কথা মনে পড়ে যায় -

"দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না -
সেই-যে আমার নানা রঙের দিনগুলি ।
কান্নাহাসির বাঁধন তারা সইল না-
সেই-যে আমার নানা রঙের দিনগুলি॥"

মুসলিম, জাহানগির, আমি, ফরিদা, বুলু আমরা ছিলাম প্রায়ই সমবয়সী। সোলেমান বদ্দার সাইকেল রিপেয়ারিং দোকান থেকে সাইকেল ভাড়ায় পাওয়া যেত। মুসলিম বেশ ভাল সাইকেল চালাত। তার কাছ থেকেই আমি সাইকেল চালানো শিখেছি। আমি ও জাহানগির সোজা শান্ত ছিলাম কিন্তু মুসলিম একটু দূরন্ত স্বভাবের ছিল। কষ্ট লাগে, আজকালকার ছেলে মেয়েরা এ রকম নানার বাড়ির সুখ আস্বাদন থেকে বঞ্চিত। আমরা দিনের পর দিন নানা বাড়িতে থেকেছি এবং আমার মামত ভাই বোনরাও আমাদের জন্য অনেক কষ্ট পেতে হয়েছে যদিও বা সে কষ্টে ছিল বন্ধনের এক নিবিড় আনন্দ। সেটা প্রকাশ পেত তখন যখন আমরা নানা বাড়ি থেকে বিদায় নিতাম তখন সবার চোখ বেয়ে বিদায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ত। কবির ভাষায়

"যেতে নাহি দিব হায় তবু যেতে দিতে হয় তবু চলে যায়"

আমার প্রয়াত নানা নানী, মামা মামী গণ বেহেস্তে অপার সুখে থাকুক সেই কামনাই করছি। সাথে সাথে করোনা কালে গত দু'বছর যাদেরকে হারিয়েছি বিশেষ করে লিলি আপার জামাই, বোন ফরিদার রুহের মাগফিরাত কামনা করছি।



স্মৃতির মনিকোঠায় ফতেহ আলী চৌধুরী বাড়ী

মাওলানা মোহাম্মদ আবু তাহের আলক্বাদেরী
অধ্যক্ষ, পোমরা জামেউল উলুম ফাযিল ডিগ্রি মাদ্রাসা

বার আউলিয়ার পূণ্যভূমি চট্টগ্রাম। এই বার আউলিয়ার পূণ্যভূমির অন্যতম মহাসাধক গাজী শেখ কদল খান রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নামকরণে কদলপুর গ্রামের নামকরণ করা হয় বলে ঐতিহাসিক বর্ণনা পাওয়া যায়। সুফি সাধক হযরত আশরাফ শাহ (রহঃ), হযরত আবু শাহ (রহঃ), হযরত আব্দুল আজিজ আল নজ্বন্দি (রহঃ), হযরত মিসকিন শাহ (রহঃ), হযরত চাঁদ শাহ (রহঃ), হযরত আজিজুল হক শাহ (রহঃ), হযরত আমিনুল হক (রহঃ), হযরত মিয়া শাহ (রহঃ) সহ অসংখ্য অলি আল্লাহর পূণ্যভূমি এই কদলপুর।

হযরত আমিনুল হক চৌধুরী (রহঃ) উনার পীর যুগশ্রেষ্ঠ আলেমেদ্বীন হযরত গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) এর বংশধর হযরতুলহাজ্ব আল্লামা গাজী সৈয়দ আব্দুল হামিদ বোগদাদী (রহঃ) এর নামে প্রতিষ্ঠা করেন ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান "কদলপুর হামিদিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা"।

এই মাদ্রাসায় ১৯৬২-১৯৭১ ইং পর্যন্ত ছাত্রজীবন ফতেহ আলী চৌধুরী বাড়িতে এবং ১৯৭৫-১৯৯১ ইং পর্যন্ত অত্র মাদ্রাসায় আরবী প্রভাষক থাকাকালীন তথা পোমরা জামেউল উলুম ফাজিল মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত প্রায় সুদীর্ঘ ২৭ বছর কদলপুরেই অতিবাহিত হয়। যার ফলে কৃতি পুরুষ মরহুম এমদাদ হোসেন চৌধুরী (মাইজ্যে মিয়া) ও মহিয়সী নারী আলহাজ্ব হাজেরা খাতুনের অভিভাবকত্বে নিজের ছাত্রজীবন এবং অত্র মাদ্রাসার আরবি প্রভাষক হিসেবে খেদমত আঞ্জাম দেয়ার সুবাদে ছাত্র এবং কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় ঐতিহ্যবাহী কদলপুর গ্রামেই অতিবাহিত হয়। কদলপুরবাসীর সাথে আমার আত্মার সম্পর্কই বটে।

হযরত আমিনুল হক চৌধুরির সহধর্মীনি মহিয়সী নারী মোস্তফা খাতুন চৌধুরী, দানবীর সুলতান আহমদ চৌধুরী, চেয়ারম্যান এমদাদ হোসেন চৌধুরী (মাইজ্যে মিয়া), ফজলুল হক চৌধুরী, ইদ্রিস মিয়া চৌধুরী, ইলিয়াস মিয়া চৌধুরী, বদিউল আলম চৌধুরী, মোহাম্মদ আলী চৌধুরী, শাহ আলম চৌধুরী, মাহাবুল আলম চৌধুরী, মোজাফফর হোসেন চৌধুরী, আবুল খায়ের চৌধুরী, সোলেমান চৌধুরী, সফিক আহমদ চৌধুরী, বোরহান উদ্দিন চৌধুরী, ফরিদ উদ্দীন চৌধুরী, আশরাফ উদ্দীন চৌধুরী, মঈন উদ্দীন চৌধুরী, মুক্তিযোদ্ধা জালাল উদ্দীন চৌধুরীর মত সফল ও সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের সাহচর্য লাভ ও দর্শনের সুযোগ হয়েছে আমার।

বিশেষত আলোকিত মানুষ গড়ার কারিগর আলহাজ্ব মৌলানা নুরুল আলম চৌধুরীর মতো ব্যক্তিত্বের। কদলপুর হামিদিয়া মাদ্রাসা, কদলপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, কদলপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ অসংখ্য ধর্মীয় ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির মাধ্যমে ফতেহ আলী চৌধুরীর পরবর্তী প্রজন্ম আজীবন কদলপুরবাসীর হৃদয়ে বেঁচে থাকবেন। শ্রদ্ধেয় আলহাজ্ব মৌলানা নুরুল আলম চৌধুরী নগরীতে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করতেন। শিক্ষার প্রতি এতটাই অনুরাগী ছিলেন যে, যখন দু-একদিনের জন্য গ্রামে আসতেন, নিজেই কদলপুর হামিদিয়া মাদ্রাসা ও হামিদিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এসে শিক্ষা কার্যক্রম তদারক করতেন। এমনকি কদলপুর হামিদিয়া মাদ্রাসায় নিজেই শিক্ষার্থীদের পাঠদান করতেন। কদলপুর হামিদিয়া মাদ্রাসা ও স্কুল সংলগ্ন বিভিন্ন ফলাদি বৃক্ষাদি উনার স্বহস্তে রোপিত। কদলপুর মাদ্রাসা সংক্রান্তে যে কোন অনুষ্ঠানাদি পালনে ফতেহ আলী চৌধুরী বাড়ির মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রম স্বচক্ষে দেখা। উনাদের আতিথেয়তায় মুগ্ধ হতেন সকলে।

আলহাজ্ব মৌলানা নুরুল আলম চৌধুরী একজন সফল শিক্ষক, সফল পিতা, সর্বোপরি একজন সফল ব্যাক্তিত্ব। সফল পিতা-মাতার সুযোগ্য সন্তান আলহাজ্ব মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক হিসেবে সাংবিধানিক পদধারী ব্যক্তিত্ব। দ্বিতীয় পুত্র আলহাজ্ব মু. মোহসিন চৌধুরী বিদ্যুৎ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব পদে কর্মরত। তৃতীয় পুত্র আমার স্নেহধন্য ছাত্র আলহাজ্ব মৌলানা মোহাম্মদ মোজাহেদুল ইসলাম চৌধুরী চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে শিক্ষার দ্যুতি ছড়াচ্ছেন নিরবধি। শিক্ষক হিসেবে একটি সুন্দর, সভ্য, সুশৃংখল জাতি গঠনের যে স্বপ্ন আলহাজ্ব নুরুল আলম চৌধুরী দেখতেন আজ উনার যোগ্য উত্তরসূরিদের মাধ্যমেই সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্তমানে ঐতিহ্যবাহী কদলপুর গ্রাম বাংলাদেশের একটি মডেল গ্রাম হিসেবে সুপরিচিত। শিক্ষার উন্নয়নে স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ও আধুনিকায়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার সমৃদ্ধি ও শিক্ষিত যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাসহ জনকল্যাণমূলক কাজে আঞ্জাম দিচ্ছেন মরহুম আলহাজ্ব নুরুল আলম চৌধুরী ও রত্নগর্ভা আলহাজ্বা খালেদা বেগম চৌধুরীর সুযোগ্য উত্তরসূরীগণ। মরহুম আলহাজ্ব নুরুল আলম চৌধুরী ও খালেদা বেগম চৌধুরীসহ চৌধুরী বাড়ির সকল মরহুম মরহুমাদের আত্মার মাগফিরাত এবং জীবিত সকলের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও উজ্জল ভবিষ্যৎ কামনা করছি।





স্বাধীনতা যুদ্ধে কদলপুর হাই স্কুলের মুক্তিযোদ্ধা

মোঃ মোজাম্মেল হক চৌধুরী

বাঙ্গালীর এ'যাবত কালের শ্রেষ্ঠ অর্জন একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত আমাদের স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আমাদের ৩০ লাখ মানুষ শহীদ ও ৩ লক্ষ মা-বোনকে ইজ্জত দিতে হয়েছিল। মাতৃভূমি ছেড়ে শরণার্থী হতে হয়েছিল প্রায় এক কোটি মানুষকে।

আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে নগণ্য কিছু সংখ্যক বাদে, বাংলার আপামর জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশ নিয়েছিল। কেউ সম্মুখ যুদ্ধে, কেউ গেরিলা যুদ্ধে, আর কেউ সাহায্য, আশ্রয় বা সমর্থন দিয়ে এ যুদ্ধে সামিল হয়েছিল। এর ব্যতিক্রম আমাদের গ্রাম বা আমাদের স্কুলও ছিলনা। আজকে আমার এ লিখা স্বাধীনতা যুদ্ধে, কদলপুর হাই স্কুলের 'মুক্তিযোদ্ধা' নিয়ে।

কদলপুর জুনিয়র হাই স্কুল ১৯৬৭ সালে কদলপুর হাই স্কুলে উন্নীত হয়। আমরা বেশ কয়েক জন ঐ বছরই রাউজানের বিভিন্ন স্কুল হতে নব কদলপুর হাই স্কুলের সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হই। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের ষাটের দশক ছিল আন্দোলন-সংগ্রামে উত্তপ্ত অগ্নিপিন্ড। ৬২ সালে শিক্ষা নীতি আন্দোলন, ৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু ৬ দফা পেশ, ৬৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগে সামরিক ও বেসামরিক বাঙ্গালী গ্রেফতার, ৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সাথীদের গ্রেফতার। সব মিলিয়ে ঢাকার রাজপথসহ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান এর জনপদ ছিল আন্দোলনে উত্তাল। এই আন্দোলন করতে গিয়ে আত্মাহুতি দেন বাংলার অনেক জনগণ। ফলশ্রুতিতে ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানে কেঁপে উঠলো তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অলি, গলি, রাজপথ।

উল্লেখ্য ধীরে ধীরে এ আন্দোলন শিখর হতে শিকড়ে উত্তাপ ছড়ালো। যা থেকে আমাদের থানার স্কুল, কলেজ এবং গ্রামও বাদ যায়নি। ৬৮ সাল থেকে আমাদের স্কুলের শিক্ষার্থীরাও বিভিন্ন ধর্মঘট ও আন্দোলনে অংশ নেয়া শুরু করেছিল। নেতৃত্বে ছিল জহীরুল ইসলাম চৌধুরী লাখী। নেপথ্যের নায়ক ছিল স্কুলের প্রথম প্রধান শিক্ষক মোজাম্মেল হক বিএ।

আমি ১৯৬৯ সালে স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র, তুমুল আন্দোলনের বছর। আমাদের ইতিহাসে ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান নামেই পরিচিত। এবছর আমরা স্কুলের ক্লাসের চেয়ে রাস্তার আন্দোলনে বেশী সময় ব্যয় করেছি। আমরা প্রতিটি হরতালে আমাদের গ্রাম থেকে প্রায় ৪ কি.মি দূরে পাহাড়তলী এমন কি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে গিয়েও তাদের কর্মকান্ডে বাধা দিয়েছিলাম। প্রতিটি হরতালে আমরা সকল প্রকার যান চলাচল, দোকানপাট খোলায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছি। এক কথায় ৬৯ এর গণআন্দোলনে আমাদের স্কুল, আমাদের গ্রাম হতে পাহাড়তলি পর্যন্ত দাপিয়ে চলত। এবছর আন্দোলন ও শ্লোগানেও নতুনত্ব এসেছিল। 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা'; 'জেলের তালা ভাঙ্গবো,

শেখ মুজিবকে আনবো'-- স্বাধীনতার ইঙ্গিতবহ এমন অনেক শ্লোগান যুক্ত হয়েছিল। এ আন্দোলনে আমাদের যুক্ত থাকার পেছনে স্কুলের শিক্ষক ও গ্রামের মুরুব্বিদের উৎসাহ আমাদের সাহস যুগিয়েছিল। ৬৯ এর গণআন্দোলন ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে একটি মহা আন্দোলন, ঢাকাসহ আরো কয়েক জেলায় শহীদ হয়েছিল অনেক। এই গণআন্দোলনে আমাদের স্কুলের ভূমিকা ছিল সিন্ধুর মধ্যে বিন্দুর মতো, তবুও এটা আমাদের অহংকার।

এই আন্দোলনের ফলে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অবসান, সকল রাজবন্দীসহ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তি, আইয়ুব খানের ক্ষমতার অবসান, ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা দখল এবং ইয়াহিয়া খান কর্তৃক ৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বরে নির্বাচন ঘোষণাসহ আরো অনেক অর্জন।

১৯৭০ সালে আমরা দশম শ্রেণির ছাত্র। আওয়ামী লীগ সারা দেশে নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু করে দিল। আমাদের ইউনিয়নেও গঠন হলো ৬০ এর দশকের শেষের দিকে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের কমিটি। নির্বাচনে আমরা থানা আওয়ামী লীগ ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছি রাতদিন। যথারীতি জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। জয়ী হলো আওয়ামী লীগ। আমরা জয়ী হলাম বটে, কিন্তু ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তর না করে বাঙ্গালীর উপর অব্যাহত নির্যাতন চালিয়ে গেলো। পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণে স্বাধীনতার পরোক্ষ এবং ২৬ মার্চ বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা দিলেন।

একাত্তরের ২৫ মার্চ রাতে হানাদার পাক বাহিনী 'অপারেশন সার্চ লাইট' এর নামে ঢাকাকে মেচাকার করল। প্রতিরোধ করতে গিয়ে শহীদ হলেন অনেক বাঙ্গালী। প্রশিক্ষিত পাক বাহিনীর নিকট বাঙ্গালীর প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়লো, সাথে আমাদের চট্টগ্রামও। আমাদের অগ্রজ যাঁরা থানা ও জেলার নেতৃত্বে ছিলেন, তাঁরা চট্টগ্রাম হানাদার বাহিনীর দখলে নেয়ার সাথে সাথে দেশত্যাগ করে ভারতে চলে গিয়েছিলেন। আমি ভারতে গিয়েছি আরো মাসখানেক পরে।

ভারতে গিয়ে এক মাস ট্রেনিং নিয়ে আমরা দেশে ফেরৎ আসি। আমাদের নেতৃত্বে ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা হাসেম চৌধুরী এবং সাথে ছিলেন আমাদের গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা কিরণ লাল আচার্য্য, পরবর্তীতে বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ ইসমাইল মিয়া শাহও আমাদের গ্রুপে যুক্ত হন। রাজাকার হতে আমাদের গ্রুপে স্বাধীনতার কিছুদিন আগে যোগ দেন আব্দুর নূর। আমরা রাঙ্গামাটি ও কাপ্তাই রোডের মধ্যবর্তী স্থানে আমাদের কার্যক্রম চালাতাম। তারপর ৯ মাস একটি সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে, বাঙ্গালীর জীবনে আসে ১৬ ডিসেম্বর- স্বপ্নের বিজয়ের মাহেন্দ্রক্ষণ। আমারা স্বাধীনতার যুদ্ধে বিজয়ী হলাম।

বিজয় আসার পর আমরা কিছুদিন উচ্ছ্বাসে দিন যাপনের পর নিজ ক্ষেত্রে মনোযোগী হলাম। আমি ছিলাম এসএসসি পরীক্ষার্থী। আবার স্কুল ও পড়াশুনায় ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

স্বাধীনতার পর স্কুল কলেজ জীবন শেষ করে ভার্সিটির জীবন শুরু করি। এর মাঝে পদ্মা-মেঘনায় অনেক জল গড়িয়ে যায়। আমি অনার্স পাস করে রাজনীতি এবং অন্যান্য অনেক সংগঠন থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিই। একান্ত ব্যক্তিগত কারণে অনার্স পাস করে, মাস্টার্স পড়া কালীন সময় চাকুরীতে যোগদান করি এবং ১৯৮১ সালে মাস্টার্স পরীক্ষা দিয়ে ঢাকায় চলে আসি। তারপর আমার গ্রামের সাথে সম্পর্ক প্রায় ক্ষীণ হয়ে আসে।

১৯৯২ সালে আমাদের কদলপুর হাই স্কুলের রজত জয়ন্তী পালনের সিদ্ধান্ত নিল স্কুলের কিছু উদ্যোগী প্রাক্তন ছাত্র। নেতৃত্বে আমাদের স্কুল, গ্রাম, থানা তথা সমগ্র চট্টগ্রামের অহংকার, বর্তমানে বাংলাদেশের সম্মানিত সিএজি মোহাম্মাদ মুসলিম চৌধুরী। দু'দিন ব্যাপী অনুষ্ঠান। বিরাট কলেবরে বিশাল আয়োজন। নানা অনুষ্ঠানমালায় সাজানো ছিল সে রজত জয়ন্তী। আমরা দারুণ ভাবে দু'দিনের এই অনুষ্ঠান উপভোগ করেছিলাম। 'অনুরণন' নামে একটি দৃষ্টিনন্দন ম্যাগাজিনও প্রকাশিত হয়েছিল। যে ম্যাগাজিনে কদলপুর হাই স্কুলের ৪জন মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানে একটি অধ্যায়ও বরাদ্দ ছিল। আমার লিখার মূল উদ্দেশ্য হলো কদলপুর হাই স্কুলের প্রকৃত "মুক্তিযোদ্ধা" ক'জন, এ'বিষয় নিয়ে।

বীর মুক্তিযোদ্ধার তালিকায় "অনুরণন" ম্যাগাজিনে বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ মোহাম্মাদ মুসা, বীর মুক্তিযোদ্ধা কিরণ লাল আচার্য্য, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মাদ ইসমাইল মিয়া শাহ্ এবং আমাকে কদলপুর হাইস্কুলের ছাত্র হিসাবে দেখানো হয়েছে। আমি আমার এ লিখায় পূর্বে বলেছি যে, যুদ্ধের সময় বীর মুক্তিযোদ্ধা কিরণ ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ইসমাইল সহ আমরা এক গ্রুপে ছিলাম। বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ মুসা আমার এক মাস আগে দেশে এসেছিলেন। কাগতিয়া রাজাকার অপারেশনে এই বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় চার জনের মধ্যে আমি জুনিয়র। আমি ছিলাম ৭১ সালে এসএসসি পরীক্ষার্থী। বাকী তিনজন ছিলেন কলেজের ছাত্র। ১৯৬৭ সালে কদলপুর জুনিয়র স্কুল কদলপুর হাই স্কুলে উন্নীত হয়। আমি কদলপুর হাই স্কুলের যাত্রা লগ্নের ছাত্র, সে কথা আগেই বলেছি। কিন্তু স্কুলে পড়াকালীন সময়ে উল্লিখিত তিন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে কদলপুর হাই স্কুলে কখনো অধ্যয়ন করতে আমরা দেখিনি। রাস্তার আন্দোলনে, বীর মুক্তিযোদ্ধা কিরণ, বীর মুক্তিযোদ্ধা ইসমাইল, শের আলীকে দেখেছি বহুবার, কিন্তু ওনাদের স্কুলের ছাত্র হিসাবে আমরা পাইনি। কদলপুর হাই স্কুলের কোন ছাত্র-ছাত্রী বলতে পারবেননা যে ওনারা এই হাই স্কুলের ছাত্র ছিলেন।

তাহলে "অনুরণন" ম্যাগাজিনে এই তিন বীর মুক্তিযোদ্ধার, কদলপুর হাই স্কুলের ছাত্র হিসাবে স্বীকৃতি ছিল কেন? এই স্বীকৃতি কতটুকু সঠিক ছিল, সে বিষয়ে কিছু বিশ্লেষণ আমি আমার আজকের লিখায় অবতারণার চেষ্টা করবো।

বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ মোহাম্মদ মুসা কোন দিন কদলপুর হাই স্কুলের আঙ্গিনাতেও পা রাখেনি, কোন ক্লাস বা শ্রেণী কক্ষে বসারতো প্রশ্নই আসেনা! কারণ উনার স্কুল ছিল, শিশু শ্রেণী হতে এসএসসি পর্যন্ত "মোহাম্মদপুর স্কুল"। উনি আমার এক বছরের সিনিয়র ছিলেন। ১৯৭০ সালে এস এস সি পাস করেন। কিন্তু তিনি যখন এসএসসি পরীক্ষার্থী তখন "মোহাম্মদপুর স্কুল" এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য AFFILIATION, বোর্ড কর্তৃক পায়নি। তাই মোহাম্মদপুর স্কুলের, ছাত্ররা কদলপুর হাই স্কুলের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করে পরীক্ষা দেন। আমি যে বছর এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছি সে বছর আমাদের ক্লাসের নিয়মিত ছাত্র-ছিল ৩০জন। কিন্তু ১৯৭১ সালের স্কুলের রেকর্ডে দেখা যায় পরীক্ষার্থী ছিল ৫৪জন। বাকী ২৪জন ছাত্র বা ছাত্রীকে আমরা জীবনে দেখিনি। এমন কি কদলপুর হাই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের কোন অনুষ্ঠানেও তাদের বিন্দু পরিমাণ অংশগ্রহ কখনো ছিলনা বা আমাদের স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রদের কমিটি হতেও তাদের অংশগ্রহনের জন্য কখনো কোন আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। যদিও তাদের মধ্যে অনেকেই সরকারের উচ্চ পদের কর্মকর্তা ছিলেন। আমরা তাদের দাওয়াত দেয়নি বা তাদের আসারও গরজ ছিলনা। কারণ তারা নিজেদেরকে কখোনো কদলপুর হাই স্কুলের ছাত্র মনে করেননি। সুতরাং আমি বা আমরা এই উপসংহারে আসতে পারি যে মোহাম্মদপুর স্কুল AFFILIATION পাওয়ার আগে যে সকল ছাত্ররা কদলপুর হাই স্কুলের মাধ্যমে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ছিলেন, তারা আমাদের স্কুলের ছাত্র নয়, শুধু পরীক্ষার্থী। এবং সনদপত্রে থাকবে আমাদের স্কুলের নাম। সে হিসাবে বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ মোহাম্মদ মুসাও আমাদের স্কুলের ছাত্র নয়, সনদে নাম থাকা আমাদের স্কুলের একজন এসএসসি পরীক্ষার্থী মাত্র। তাই তাঁকে আমাদের স্কুলের মুক্তিযোদ্ধা বলা কি সমুচিত হবে? যদিও তাঁকে মোহাম্মদপুর স্কুল, নিজেদের স্কুলের বীর মুক্তিযোদ্ধা মনে করে। এখানে একটা বিষয় উল্লেখ না করে পারছিনা, আমি শিশু শ্রেনি হতে ষষ্ঠ শ্রেনি পর্যন্ত আর্য্যমৈত্রেয় প্রাইমারী ও হাই স্কুল এর ছাত্র ছিলাম। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আর্য্যমৈত্রেয় স্কুল কখনো আমাকে, ঐ স্কুলের মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে পরিচিতি দেয়নি বা আমি নিজেও বলিনি। আমি আমার একটি পরিচয়কে দ্বিধাবিভক্ত করিনি। তাই আমি সে হিসাবে মনে করি, আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা যুদ্ধের মহান শহীদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ মুসা, মোহাম্মদপুর স্কুলের গর্বিত ছাত্র। আমার বিশেষিত ব্যাখ্যার গ্রহণযোগ্যতার বাকিটুকু পাঠকের বিচার্য ।

"অনুরণন" ম্যাগাজিনে বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ ইসমাইল মিয়া শাহ ও বীর মুক্তিযোদ্ধা কিরণ লাল আচার্য্যকেও কদলপুর হাই স্কুলের মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে পরিচিতি দেয়া হয়েছিল। আগেই বলেছি উপরোক্ত দুই বীর মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধকালীন সময়ে আমার গ্রুপযুক্ত ছিলেন। কিন্তু উনারা দুজন ছিলেন কদলপুর জুনিয়র স্কুলের ছাত্র। দুজনই কদলপুর হাই স্কুল হওয়ার আগেই, জুনিয়র স্কুল হতে অষ্টম শ্রেনি পাস করে, অন্য স্কুলে এসএসসি পরীক্ষা দেয়ার জন্য ভর্তি হয়েছিলেন। বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ ইসমাইল মিয়া শাহ সম্ভবত ৬৫ এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা কিরণ লাল আচার্য্য ৬৬ সালে কদলপুর জুনিয়র স্কুল ত্যাগ করেন। সুতরাং পরিষ্কারভাবে বলা চলে, উনারা দুজন কদলপুর হাই স্কুলের ছাত্র নয়। কদলপুর জুনিয়র স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তাই কদলপুর হাই স্কুলের মুক্তিযোদ্ধা তালিকায় উনাদের নাম আসা যুক্তিযুক্ত নয়।

আজ থেকে ২৭/২৮ বছর আগেও যখন প্রকৃত তথ্য বা সত্য প্রায় সকলের কাছে বিস্মৃত ছিল, আমার মনে হয় এখন তা আরও বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে গেছে। তাই সত্যটাকে স্মৃতিপথে আনার আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। অবশ্য এখানে উল্লেখ্য যে, কদলপুর হাই স্কুলের সুবর্ণ জয়ন্তীতে প্রকাশিত ম্যাগাজিন "অদম্য"তে সে ভুল আর হয়নি। বীমাবিদ বন্ধু ও সহপাঠী স ম ইউসুফ, সম্পাদক এবং সম্পাদনা পরিষদের সকল সদস্যদের সে জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ, ইতিহাসকে সঠিক ভাবে মূল্যায়ন করার জন্য। যেখানে কদলপুর হাই স্কুলের মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে একজনকেই স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এরপরও "অনুরণন" এর "মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক" অধ্যায়ের, একটি স্বচ্ছ ব্যাখ্যা প্রয়োজন মনে করে এ'লেখা।

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে আমাদের কদলপুরের সকল শহীদ, সকল সংগঠক, সকল মুক্তিযোদ্ধা, সকল নিপীড়িত, যারা বেঁচে আছেন আর যাঁরা ইহজগৎ ত্যাগ করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আমার অন্তর নিংড়ানো অতল শ্রদ্ধা।

আর মহান দয়ালু আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের নিকট নিবেদন, যাঁদের নামে কল্যাণ কার্যাদি সম্পাদনের নিমিত্ত, এই কল্যাণ ট্রাস্ট গঠিত, তাঁদের দুজনকেই আপনি জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানে অধিষ্ঠিত করুণ। আমীন।

তথ্য দিয়ে সহায্য করার জন্য কৃতজ্ঞ:

১। বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ইসমাইল মিয়া শাহ

২। বীর মুক্তিযোদ্ধা কিরণ লাল আচার্য্য

৩। অধ্যাপক আখতার আলম চৌধুরী

৪। বীমাবিদ এস এম ইউসুপ

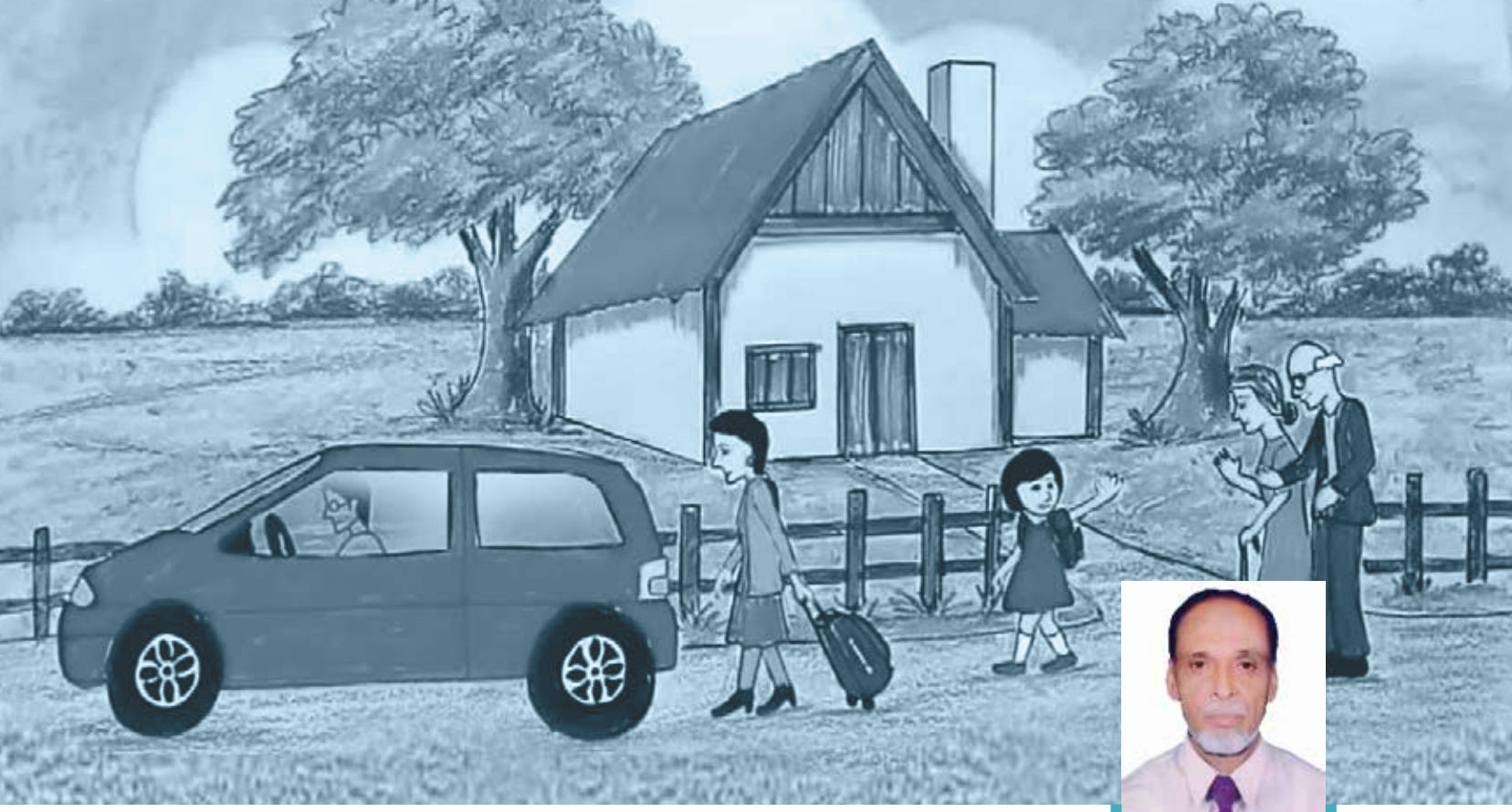

আমার স্মৃতির আয়নায় নানাবাড়ি ফতেহ আলি চৌধুরী বাড়ি

এস খালিদ খান (বাচ্চু)
সাবেক সিনিয়র কমার্শিয়াল ম্যানেজার, নেসলে বাংলাদেশ লিমিটেড
খালদার খান চৌধুরী বাড়ি, মোবারকখীল, গহিরা, রাউজান, চট্টগ্রাম

শৈশব ও কৈশোর কালের স্মৃতির আয়নায় নানাবাড়ি মানেই মহা আনন্দ বাড়ি। প্রথমে যেটা মনে পড়ে সেটা হল নানা বাড়িতে বাবা-মা ও আমার ছোটভাই শওকতসহ সাম্পানে করে বেড়াতে যাওয়া। আনন্দ লাগত সাম্পানের মাঝির বৈঠার ক্যারেং ক্যারেং শব্দ। বাড়ি পৌঁছে আমরা ছোটরা সবাই মিলে সাম্পানের সেই ক্যারেং ক্যারেং শব্দ করে খেলতাম। আরো মজা লাগতো নানি যখন আমাদেরকে পিঠাপুলি, মোয়া, খেজুরের রস ইত্যাদি খেতে দিতেন এবং পিছনে পুকুরপাড়ের রোদে বসিয়ে গোসল করিয়ে দিতেন আর হেসে হেসে বলতেন- খাঁ সাহেব বড় দুষ্ট। বাবা ছাড়া আমরা ভাইবোনরা মায়ের সঙ্গে যেতাম বিশেষ করে শীতের মৌসুমে স্কুল বন্ধকালীন সময়ে। মাঝে মাঝে আমি যেতাম না দাদির সাথে নিজ বাড়িতে থাকতাম স্কুলের জন্য। তবে প্রতি বৃহস্পতিবারে স্কুল হাফ ডে করে পায়ে হেঁটে নানা বাড়ি যেতাম, মাগরিবের আগে বা পরে পৌঁছাতাম ও শনিবার সকালে পায়ে হেঁটে রাউজান হয়ে গহিরা হাই স্কুলে দশটার ভিতরে পৌঁছে যেতাম। তখন সম্ভবত আমি সপ্তম শ্রেণীতে পড়ি। একবার নানাবাড়ি থেকে আমরা সবাই গরুর গাড়িতে করে ফিরছিলাম। তখন নানী খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং বেশ অনেকদিন রোগভোগের পর ইন্তেকাল করেন। মনে পড়ে আমার মা পাগলের মতো করে কান্না করেছিল এবং খালামণি বুকে চেপে ধরে সান্তনা দিচ্ছিল। উনি মারা যাওয়ার আগে নানা-নানি, বড় মামা এবং সাথে আমিও জিপে করে নানুপুর নানুর বড় বোনের ছেলের (মির্জা আবু) বড় মেয়ের বিয়েতে যাই যেখানে অনেক মজা হয়েছে। ওই বিয়েতে নানী সবাইকে বলতো আমার ফাতুর (মায়ের পারিবারিক নাম) বড় ছেলে। নানা বাড়িটা বিশাল বড় পারিবারিক বাড়ি ছিল। জমিদার বাড়ির ঐতিহ্য নিয়ে সদর রাস্তার পশ্চিম পাশে চারটি পারিবারিক বসবাস ছিল। উত্তর প্রান্তে একটি, মধ্যখানে দুটি এবং দক্ষিণ প্রান্তে দুটি। নানাভাই ও ছোট নানা থাকতেন মধ্যখানে, উনারা ৪ ভাই ছিলেন। সম্ভবত ৫০ বছর না পেরোতেই দুই ছোটভাই ওপারে চলে গেছেন। নানাভাই ও ছোট নানা থাকতেন প্রায় ৩০ হাত লম্বা মাটির দোতলা দালানে। সামনে উঠান ও উঠানের একপাশে পশ্চিম প্রান্তে ধান রাখার গোলা। উঠান পেরিয়ে আবার একইভাবে ৩০ হাত লম্বা কাচারী ঘর। তবে এর মাঝখানে সদর ফটক ছিল তারপর আবার খালি উঠোন ও দক্ষিণ দিকে প্রায় ১৫ হাত লম্বা আরেকটি বাঁশ বেড়া দিয়ে তৈরি বাহির কাচারি। মধ্যের কাচারীতে মেহমান এবং গৃহশিক্ষক বা মৌলভী সাহেবরা থাকতেন। আর বাহিরের কাচারিতে পালকি, ছদুল ও মেজবানের বড় বড় হাড়ি পাতিল, পাটি ইত্যাদি রাখা হতো এবং শীত মৌসুমে ধান উঠার পর বিভিন্ন জায়গা থেকে ভান্ডারিরা তাদের পণ্য সামগ্রী হাড়ি-পাতিল, কাঁথা, লেপ, তোষক ও মনোহারী জিনিসপত্র ইত্যাদি বিক্রির জন্য আসতো, তারা ঐ কাচারীতে বিনা পয়সায় রাত্রিযাপন করত। এই কাচারির পরে আবার খোলা উঠোন এরপরে রাস্তা এবং রাস্তাসংলগ্ন বড় পুকুর পুরুষরা সবাই ব্যবহার করত।

বড় বড় মাছ পাওয়া যেত পুকুরে। পুকুরপাড়ের উত্তরে নিজেদের ব্যবস্থাপনায় প্রতিষ্ঠিত কদলপুর হামিদিয়া মাদ্রাসা (বর্তমানে এমপিওভুক্ত) পশ্চিমে ঐতিহ্যবাহী পূর্বপুরুষদের দিঘী। পুকুরের পশ্চিম-দক্ষিণ কোনে মোগল স্থাপত্য নির্মিত মসজিদ এবং তদসংলগ্ন পারিবারিক কবরস্থান। দিঘীর উত্তর-পূর্ব কোণে পারিবারিক সাপ্তাহিক বাজার সপ্তাহে দুই দিন বসে। মসজিদের দক্ষিণে রায়ত প্রজাদের বাড়ি। মূল বাড়ির পিছনে কিছু খোলা জায়গায় তিনটি পুকুর রয়েছে যা মহিলারা ব্যবহার করেন। নানাভাইয়ের তিন ছেলে দুই মেয়ে। আমার মা ছোট মেয়ে। এখন শুধু ছোট ছেলে বেঁচে আছেন। বড় ছেলে মরহুম বদিউল আলম চৌধুরী, সরকারি হিসাব ও নিরীক্ষা কর্মকর্তা ছিলেন। ঢাকায় স্থায়ী হয়েছিলেন বাড়িঘর করে। উনি খুব স্পষ্টভাষী, মিশুক এবং পরোপকারী ছিলেন। চট্টগ্রাম বা অন্য জেলার সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী অবসরে গিয়ে কোন জটিলতায় পড়লে অনেকে উনার কাছে সহযোগিতার জন্য যেতেন এবং উনার বাসায় থাকতেন। উনি সবাইকে সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতা করে দিতেন। আমি ঢাকায় চাকরি করার সময় উনার বাসায় অনেক থেকেছি। মামা-মামীর আদর ভালবাসা এবং মামাতো ভাইবোনের ভালোবাসা ও সম্মান কোনদিনও ভুলতে পারবো না। আল্লাহ মামা-মামীদেরকে বেহেস্তে নসিব করুক। মেজো ছেলে অর্থাৎ আমার মেঝ মামা মাওলানা নুরুল আলম চৌধুরী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। মনে পড়ে উনার বিয়ের সময় সম্ভবত আমি তখন চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি। উনার সাথে বিয়ের সাজানো বড় নৌকায় করে উনার শ্বশুর বাড়ি হাওলা গিয়েছিলাম। উনার শ্বশুর সাহেব মাওলানা আব্দুল হক বড় কামিল আলেম ও বুজুর্গ ছিলেন। আরো মনে পরে উনি একবার নানা বাড়ির মেজবানের ওয়াজ মাহফিলে তসরিফ এনেছিলেন এবং আমার খালু মরহুম মাওলানা আব্দুল কাদের সাহেবও ওই মাহফিলে অংশ নিয়েছিলেন। মেজমামা খুব সাদাসিদে ছিলেন। পৈত্রিক ও পারিবারিক আর্থিক সামর্থ্য খুবই ভালো ছিল। কিন্তু সেটার কোনো অহমিকা উনার জীবনযাপনে মোটেও প্রকাশ পায়নি। তিনি সহজ-সরল ও স্পষ্টভাষী ছিলেন। আমি যখন কলেজে পড়ি, তখন জানতে পারি যে চট্টগ্রাম মহিলা কলেজ জুমা মসজিদ সংলগ্ন পশ্চিম দিকে বর্তমান এমইএস স্কুল এন্ড কলেজ যে জায়গায় চালু হয়েছিল মেজ মামাই প্রথম এর প্রতিবাদ করেছিলেন। মসজিদের সাথে একটি মহিলা কলেজ থাকা মানে মসজিদের অবমাননা তথা মুসুল্লিরা এবং কলেজে আসা মহিলারা গুনাহগার হওয়ার সম্ভাবনা হতে পারে। এ ব্যাপারে জনমত গঠনে তিনি নিজ বেতনের টাকায় লিফলেট ছাপিয়ে জুমা মসজিদে নিজেই বিতরণ করেছিলেন। ডিসি সাহেব উনাকে তলব করেছিলেন। পরে অবশ্য মরহুম বাদশা মিয়া চৌধুরীও মামার সাথে একমত পোষণ করেন এবং পরবর্তীতে কলেজ অন্য জায়গায় সরিয়ে নেওয়া হয়। বর্তমানে সরকারি মহিলা কলেজ তৎকালীন গভর্নর জনাব জাকির হোসেন সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় খুলশীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই বলতে পারি উনি ন্যায্য কথা বলতে বা কাজ করতে কখনো পিছপা হতেন না। আজ উনি নেই আল্লাহর কাছে চলে গেছেন। আল্লাহ নিশ্চয়ই উনার প্রতি সদয় হবেন এবং জান্নাত দান করবেন। ছোটমামা ডাক্তার শফিউল আলম চৌধূরী বড়মামার সাথে ঢাকায় থাকতেন ও ডাক্তারি পড়তেন। উনি সরকারি ডাক্তার হিসেবে কুমিল্লা, কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন স্থানে কর্মরত ছিলেন।

উনিও খুব সরলসিদা ও পরোপকারী চিকিৎসক ছিলেন। আল্লাহর রহমতে ছেলেমেয়ে নাতিনাতনি নিয়ে ভাল আছেন। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি উনি যেন সুস্থভাবে দীর্ঘায়ু হোন। নানাভাই সবার বড় ছিলেন। জ্ঞানী ধার্মিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং পরোপকারী ছিলেন। হক হালালের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। মানুষকে জানতেন বুঝতেন এবং সঠিক বিবেচনা করে বিচার সালিশ করতেন। ছোটভাইয়ের দুই নাবালক ছেলে যখন তাদের পিতাকে হারালেন তখন নানাভাই তাদের ও তাদের মাকে সার্বিকভাবে দেখে রেখেছিলেন যাতে কেউ কষ্ট না দিতে পারে বা সহায় সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে না পারে।

আমি নাতিদের মধ্যে একটু বেশি ওনার আদর ও ভালোবাসা পেয়েছি। মেজমামী আমাকে নানাভাইয়ের বন্ধু বলতো। যখন নানাবাড়ি যেতাম সম্ভবত কলেজে পড়ার সময় বা পরেও মামী বলতেন আমার আব্বার বন্ধু এসে গেছে, আর আমাদের কাউকে দরকার নাই। মেজ মামীও খুব আদরস্নেহ করতেন। পুরো পরিবারের সমগ্র দায়িত্ব উনি দক্ষতার সাথে মুরুব্বিদের দোয়া নিয়ে পালন করতেন। উনার ৩ ছেলে সমাজের উজ্জ্বল নক্ষত্র মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী, মু. মোহসিন চৌধুরী ও মোজাহেদুল ইসলাম চৌধুরীর রত্নগর্ভা মা হয়ে আল্লাহর কাছে চলে গেছেন। আল্লাহ উনাকে বেহেস্ত নসিব করুক।

নানাভাইয়ের সম্পর্কে দুটি বিশেষ স্মৃতি উল্লেখ করে শেষ করছি-- প্রথমটা হলো উনার স্নেহধন্য হয়ে হামিদিয়া মাদ্রাসার মুহাদ্দিস হাফেজ মোঃ হাফিজুর রহমান সাহেবের কাছ থেকে প্রথম পবিত্র কোরআন শরীফ হাতে নিয়ে ছবক নিই। সেই উপলক্ষে ছোট আসরে মিলাদ ও মিষ্টিমুখ করা হয়েছিল।

দ্বিতীয়টা- নানাভাই যেদিন মৃত্যুবরণ করেছিলেন, সেদিন আমি চাকরির জন্য ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরেছিলাম। বাড়ি ফিরে জানতে পারি এই দুঃসংবাদ। মাকে ধরে আমি অনেক কেঁদেছিলাম এবং কথাবার্তা বন্ধ হয়ে বোবার মত হয়ে গিয়েছিলাম। পরে ধীরে ধীরে শোক কাটিয়ে উঠেছিলাম। বড় মামা তখন চট্টগ্রাম ফোজদারহাট ক্যাডেট কলেজে ছিলেন বলে উনি নানার মৃত্যুশয্যার সময় পাশে থাকতে পেরেছিলেন।

নানা-নানী, মামা-মামী ও মামাত ভাইবোনদের ভালোবাসা আদর ও সম্মান যথাক্রমে যে পরিমাণে আমি পেয়েছি তার ঋণে পরিণত হয়েছে, যা পরিশোধ করার কোন ক্ষমতা আমার নেই। শুধু আল্লাহর কাছে শুকর গুজার মোনাজাত ও দোয়া করতে পারি। ছোট ভাইবোনেরা যে যেখানে আছে যেন আল্লাহর রহমত নিয়ে ভালো থাকে এবং মহান আল্লাহর কাছে মোনাজাত করি নানা-নানীসহ মুরুব্বীদের রসুলের সুপারিশ ও আল্লাহ জান্নাত নসিব করুক-- আমিন।



স্মৃতিময় নানার বাড়ী কদলপুর

অধ্যাপক মোহাম্মদ রায়হান উদ্দিন খান

শৈশব ও কৈশোরে বার্ষিক পরীক্ষা শেষে নানার বাড়িতে মাকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার প্রতিটি ক্ষণ ও ঘটনা স্মৃতির পাতায় জ্বলজ্বল করে এখনো ভাসছে। মনের গহীন স্মৃতিতে প্রথম ছবি নানার বাড়ী- কদলপুরের ফতেহ আলী চৌধুরী বাড়ী। প্রাচীন স্থাপত্যশৈলীর প্রায় দুই হাত চওড়া মাটির দেওয়াল বিশিষ্ট মূল ঘর। পেছনে ছিল ৩টি পুকুর। সামনে ছিল ধানের গোলা। এক সারিতে কাচারি ঘর। সামনে বড় পুকুর। শান বাধানো ইট-সুরকির বৈঠকখানাসহ পুকুরঘাট। পুকুরের পাশ ঘেষে রয়েছে রাস্তা, যেখানে এখন প্রচুর গাড়ি চলাচল করে। পুকুরের উত্তর পাড়ে কদলপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, কদলপুর হামিদিয়া মাদরাসা ও কদলপুর ইউনিয়ন হেলথ সেন্টার। বাড়ীর উত্তরে বিশাল দিঘী। দিঘীর পূর্বপাড়ে আশরাফ আলী চৌধুরী হাট, বাড়ির সর্বদক্ষিণে মোঘল বাদশাহী স্টাইলের মসজিদ বর্তমানে সেখানে পুরনোটির সাথে একটি আধুনিক মসজিদ গড়ে তোলা হয়েছে। মসজিদের পূর্বে প্রজাদের ভিটাবাড়ী। সব মিলিয়ে একটি জমিদার বাড়ীর ছাপ ফুটে উঠে। মায়ের কাছে শুনেছি বিয়ের পর দুয়েক বছর মা কদলপুর নাইয়ুর যেতো পালকিতে চড়ে। সম্ভ্রান্ত পরিবারের বউ ঝিয়েরা তখন পালকিতে বাপের বাড়ি আসা-যাওয়া করতো। মোঘল সম্রাট, বেগমদের চলাফেরার জন্য পালকি তৈরী করেছিল বলে ইতিহাসে পাওয়া যায়। আমাদের কাচারি ঘরে এখনো পালকি ও চদুল বিদ্যমান আছে। আর আমাদের ছোট বেলায় নানারবাড়ি যাওয়া হতো সাম্পানে করে। পরে রিকশাতে শাড়ী পেচিয়ে জলিলনগর বাসস্ট্যান্ড থেকে পাহাড়তলীগামী রাস্তাদিয়ে কদলপুর যাওয়ার সময় অনেক গুলি ব্রিজ বা পুল ছিল। রিকশাওয়ালা অনেক কষ্ট করে রিকশা টেনে তুলতো। রাস্তা ছিল ভাঙ্গা, এখন আর সেদিন নাই। এ রাস্তা এখন পাকা ও পিচঢালা হয়েছে। একদম মসৃণ, বিদেশী রাস্তার মত। বিদ্যুৎ গতিতে গাড়ী চলে। সাবেক অর্থ সচিব ও বর্তমান সিএজি জনাব মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরীর সুবাদে এই রাস্তা উন্নয়ন হয়েছে। গত ঈদে নানার বাড়ী যাচ্ছিলাম। এক ড্রাইভার নিজ থেকেই বলা আরম্ভ করল, মুসলিম চৌধুরী সম্পর্কে। যদিও আমার পরিচয় তারা জানত না। বলতে লাগলো দেখেছেন কি সুন্দর রাস্তা, কি দারুণ পরিবেশ, খুব অল্প সময়ে সুন্দরভাবেই পাহাড়তলী চলে যাওয়া যায়। এখন গাড়ী চালাতে আমাদের কষ্ট হয়না। বলেই চলেছে, ওরা ৩ ভাই আমাদের কদলপুরের রত্ন। শুধু একবার নয় বারবারই তাঁদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। শুধু কদলপুর নয়, রাউজানসহ সারা বাংলাদেশের অনেক রাস্তাঘাট, মসজিদ-মাদ্রাসা, স্কুল-কলেজ, সমাজসেবামূলক কার্যক্রম, অনেক লোকজনের কর্মসংস্থানসহ নানা ক্ষেত্রে অবদান রেখে চলেছেন। তাঁরা তিনজনই আমার নানা সুলতান আহমদ চৌধুরীর উত্তরসূরী। আমার নানা আমার মাকে আদর করে ফাতু বলে ডাকতেন। উনার হাতের লেখা একটি চিঠিতে আমি পেয়েছি। এই লেখনীর শেষে আমার মাকে লেখা নানা সুলতান আহমদ চৌধুরীর চিঠি, আমার বড় মামাকে

লেখা নানার চিঠি এবং আমার বড় ভাই বাচ্চুকে লেখা আমার মায়ের চিঠি সংযুক্ত করেছি। আমার নানি ডাকতেন ফাতলা। এটি আমার মায়ের ডাকনাম ছিল। আসল নাম রওশন আরা চৌধুরী। নানার কথা বা চেহারা কেমন ছিল তা আমার মনে নেই। তবে নানীর কথা মনে আছে। হালকা পাতলা গড়নের। অনেকটা আমার মায়ের মত।

আমার মা নানীর পাশে থাকতেন। আমি কান্না করলে আমার মাকে বলতেন অ ফাতলা, "আর নাতিরে দুধ-দি দুওয়া ভাত দে"। নানির এ স্মৃতিটুকু কেবল মনে আছে। এবার অন্য কথায় আসি বাড়ীর সামনে লম্বা উঠোন।

উঠোনে সবাই মিলে বিভিন্ন খেলা করতাম। সুপারী গাছের খোল দিয়ে গাড়ী বানাতাম। একজন বসতো আরেকজন টানতো। নানার ঘরের সামনে থেকে শুরু করে মাইজ্জা মিয়াদের (এমদাদ হোসেন চৌধুরী) উঠোনে একটা চাঁপা ফুল গাছ ও তেজপাতা গাছ ছিল সেখানে গিয়ে থামতাম। এভাবে পালাক্রমে চলতো। শামুকের খোলসকে ঘষে ছুরি (ছি-লইন) বানিয়ে আমি, মোহসিন (বর্তমান অতিরিক্ত সচিব), মনসুর (উপ অর্থ নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম সেনানিবাস) ও ফরহাদ (সমাজসেবক) মিলে একসাথে আম খেতাম। খেজুরের রস পেরে খেতাম আমি আর মাহাবুমামুর শ্যালক সবদর আলী (এসডিও-র ছেলে- বর্তমানে পাকিস্থানের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী) মিলে। সবদর আলী তখন খুব দুরন্ত ছিল। মেজমামীর হাতের রান্নার মজা ছিল আলাদা। আমার মা বলতেন মাইজ্জা ভাবি হাতে ছুয়ে দিলেই সেটা মজা হয়ে যায়। সুন্দরনানীর (মোস্তফা খাতুন- আমিনুল হক চৌধুরীর স্ত্রী) ঘরে দাওয়াত খেতাম। ৪/৫ ধরণের মাছ ও মুরগীর মাংসসহ ৮/১০ পদের তরকারী থাকত।

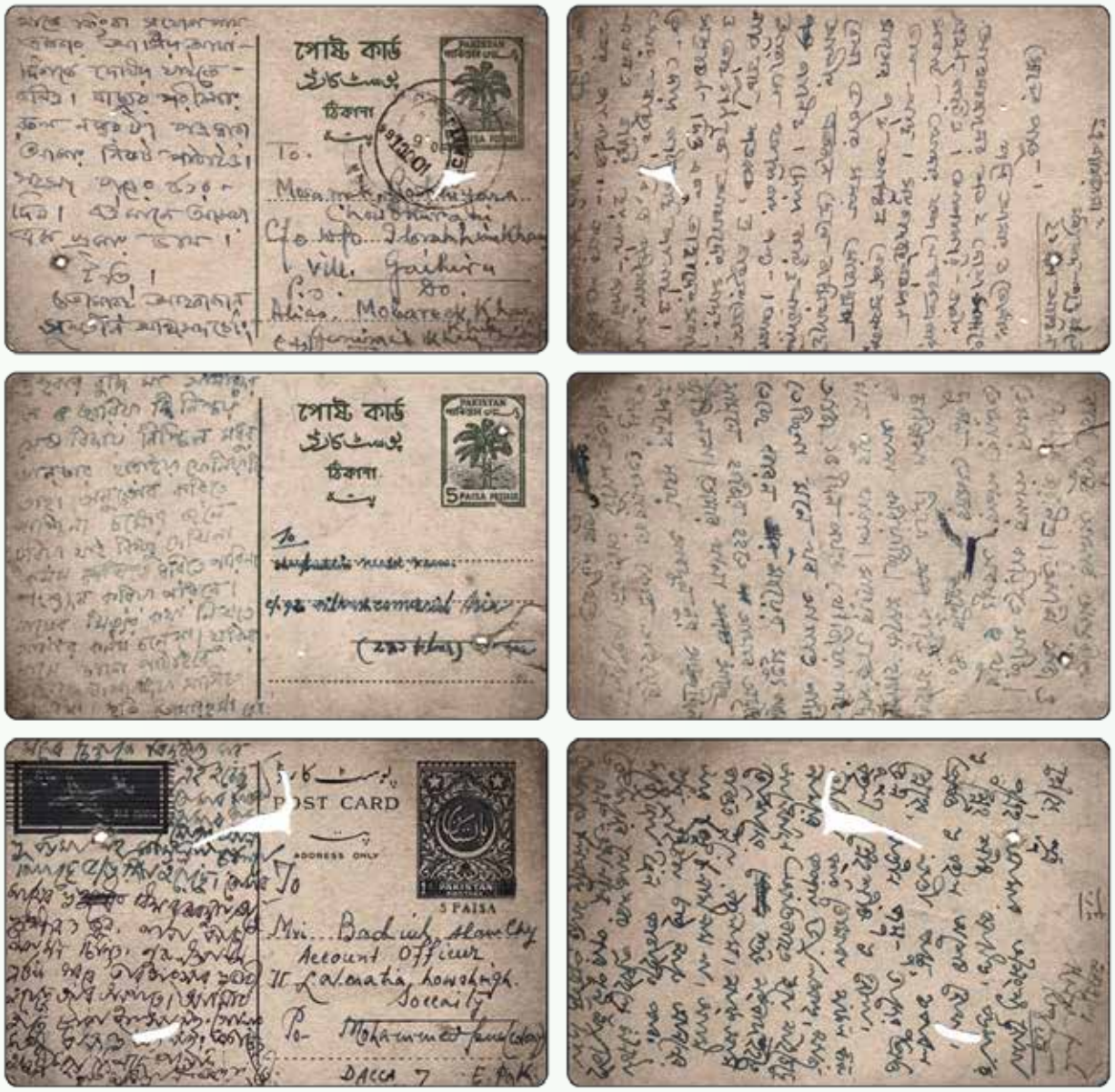

ইলিয়াসমামু এবং শাহ আলম মামুর ঘরেও দাওয়াত খাওয়া হতো। ইলিয়াসমামু শ্বশুরবাড়ী মোবারকখীল আসলে, আমার মাকে দেখতে আসতেন। শাহ আলম মামু আমার মায়ের জমির ধান মানুষ দিয়ে ঘাটকূল থেকে সাম্পানে তুলে দিতেন। সাম্পানে করে আমাদের বাড়ীর পাশের খালে এসে ভিড়ত। হাটবারে হাটে মেঝমামার সাথে যাওয়া হতো। হাটবারে দিঘীর পাড়েও যেতাম।

আশরাফ আলী চৌধুরী হাট থেকে দই কিনে দিঘীর পাড়ে বসে খেতাম। অন্যদিন দিঘীর পাড়ে যেতে ভয় পেতাম। কারণ তখন দিঘীর পানিতে বড় বড় শাপলা পাতা ও ফুল ছিল। শাপলার গোড়ায় কাটাফল থাকত, যাকে চট্টগ্রাম এর ভাষায় সিঙ্গুরি বলা হয়। খেতেও হালকা মিষ্টি ছিল। জনশ্রুতি ছিল বিয়ের জন্য সেখানে চিঠি ফেললে পরের দিন পরীরা রুপার থালা-বাসন তুলে দিত। দিঘীটা দেখলেই এই কথা মনে উঠত। এছাড়া মানচিপাড়া লস্কর দিঘীতেও এমনটা হত বলে জনশ্রুতি আছে। তাছাড়া কদলপুরের বিভিন্ন হাটবাজার যেমন- চাঁদ শাহ্ (রঃ) মাজার সংলগ্ন শান্তিরহাট, নুর আলী মুন্সিরহাট, ইশান ভট্টের হাট এসব জায়গায় মামাতোভাই মোহসীন চৌধুরীসহ ঘুরতাম। এছাড়া বিখ্যাত দরবেশ হযরত আবু শাহ (রঃ) ও হযরত আশরাফ শাহ (রঃ) এর মাজার শরীফ ও জিয়ারত করা হত। মাজারের ফটকে একটি হাতি আকৃতির বটগাছ ছিল।

কদলপুরের বিখ্যাত কয়েকজন ব্যক্তির মধ্যে অন্যতম হলেন মরহুম জনাব জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলু। তিনি এরশাদ সরকারের আমলে শিক্ষা, জ্বালানীসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হিসেবে রয়েছেন শফি মোটরসের স্বত্তাধিকারী এস এম শফি, যিনি শফি কোম্পানী নামে পরিচিত। বর্তমানে কদলপুর ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন অগ্রণী ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর জনাব নিজাম উদ্দীন আহমদ চৌধুরী। অতীত-বর্তমান মিলিয়ে ওলি দরবেশের স্মৃতিধন্য কদলপুর ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যবাহী এক গ্রাম। পরিশেষে এটাই বলব দিন দিন সমৃদ্ধ হোক এই কদলপুর, শান্তিতে দিনাতিপাত করুক কদলপুরবাসী।

আমার নানা-নানী, মামা-মামীসহ সকল কবরবাসীদের আল্লাহতাআলা বেহেশত নসীব করুন আমিন। ওয়াখের দাওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।





আমার দেখা আমার গ্রাম কদলপুর

এস এম ইউসুফ (বীমাবিদ)

শৈশবের প্রারম্ভে আমার পরিবার ও দুই-তিনটা ঘর নিয়ে আমার বিচরণ। দেখেছি ১৯৫৮ সালের মার্শাল ল'। গ্রামে খাকি কাপড়ের হাফশার্ট, হাফপ্যান্ট, দেড় হাত লম্বা লাঠি হাতে পুলিশ এসে জলাভূমির ফেনা, ময়লা আর্বজনা, রাস্তার পাশে জঙ্গল পরিস্কার করার নির্দেশ দিলে, সবাই তটস্থ হয়ে শতভাগ কার্যকর করতে দেখে অনুমান করলাম পুলিশ সর্বময় ক্ষমতাবান।

দেখেছি ১৯৫৯ সালে ইউনিয়ন কাউন্সিলের ভোট। উক্ত ভোটে মহিলা ভোটার উপস্থিত ছিল ২০%। স্কুলে ভর্তি হয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাহচর্যে এসে চেনা জানার পরিধি বাড়তে লাগল। ছোটদের খেলা ছিল কানামাছি, লুকোচুরি, চোর-পুলিশ, কুতকুত ও টেনিস। বড়দের খেলতে দেখেছি হা-ডু-ডু, ডাংগুলি, দাড়িয়াবাঁধা ইত্যাদি। ষাট দশকের মাঝামাঝি সময়ে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে কেরাম, দাবা, ফুটবল, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন খেলার প্রচলন হয়। সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও স্কুলের উদ্যোগে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় হরেক রকমের খেলাধুলা হত। বিনোদনের মাধ্যম ছিল বলিখেলা, গরুর লড়াই ও নাটক। বেশিরভাগ নাটকে মহিলা চরিত্রে অভিনয় করত পুরুষেরা। বর্ষাকলে গ্রামের পশ্চিমপার্শ্ব বন্যার পানিতে ডুবে থাকতো সেখানে সহজে নৌকা ভ্রমণ করা যেত। রাঙ্গামাটি রুট থেকে কাপ্তাই রুটের মাঝখানে কোন রাস্তা ছিল না।

মেহেদী অনুষ্ঠানে পুরুষেরা পুঁথি পাঠ করত। অন্দরমহলে মেয়েরা নাচগান করত, সেখানে পুরুষদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। বিয়েতে বর-কনের বাহন ছিল চৌদুল ও পালকি।

গ্রামের ৮৫% ছিল কৃষির উপর নির্ভরশীল। বেশিরভাগ ছিল বর্গাচাষি। যৎসামান্য কিছু সংখ্যক ব্যক্তিবর্গ আয় উপার্জনের জন্য বিভিন্ন শহর-বন্দর-নগরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। মুরুব্বিদের কাছে শুনেছি আমাদের জন্মের পূর্বে ৪০-৫০ এর দশকে কিছু সংখ্যক লোক আয় উপার্জনের জন্য মিয়ানমার যেত। ৫০ দশকের পর কলকাতায় যাওয়া শুরু করল এবং ৬৫ সালে পাকিস্তান ভারত যুদ্ধের পর করাচি যাওয়া আরম্ভ করল।

রমজান মাসে স্বচ্ছল ব্যক্তিরা গরীবদের ধান বিতরণ করত। যারা রবিশস্য উৎপাদন করত, তারা উৎপাদিত ফসল থেকে প্রতিবেশি ও আত্মীয়স্বজনদের বিতরণ করত। গ্রামে প্রায় প্রত্যেক পরিবারে হাঁস-মুরগি, ছাগল, গাভী ছিল। পুকুরে, খালে-বিলে পর্যাপ্ত মাছ পাওয়া যেত। প্রত্যেক পরিবারের ঘরের চারপার্শ্বে লেবু, পেঁপে, মানকচু, কাঁচকলা, বারোমাসি বেগুন, ঢেঁরষ, শিম, বরবটি, ঝিঙ্গা ইত্যাদি উৎপাদন করত। পাশাপাশি ঘরের চালে বা পুকুর পাড়ে লাউ কুমড়া উৎপাদিত হত।

সাপ্তাহিক বাজারে যাওয়ার সময় লাল কেরোসিন, সাদা কেরোসিন, সরিষার তেল, নারিকেল তেল, বাদাম তেলের বোতল এবং খেজুর গুড় ও তামাকের মিঠা আনার জন্য হাড়ি নিয়ে যেত। ষাট দশকে ৬৪ পয়সায় ১ টাকা ছিল। মাঝামাঝি সময়ে ১০০ পয়সায় ১ টাকা মান

হওয়ায়, ২ আনার বাজার করে ক্রেতা-বিক্রেতাকে ২৫ পয়সার মুদ্রা দিলে, ১৩ পয়সা পাবে তা নিয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে বাগবিতন্ডা লেগে থাকত। কিংবা ৩ আনার বাজার করার পর বিক্রেতা ১৯ পয়সা দাবি করলে, ক্রেতা ১ পয়সা বেশি দিতে অস্বীকার করত।

বেশিরভাগ লোক খালী পায়ে হাঁটা-চলা করত। সকালের নাস্তা ছিল পান্তাভাত, বিকালে কলা-মুড়ি ও ঘরের তৈরী বিভিন্ন পিঠা-পুলি। বেশিরভাগ পরিবার সহজে হজম না হওয়ার জন্য মোটা চালের ভাত খেত। ৯৫% পরিবার বিবিধ প্রয়োজনে পাটি-মাদুরা ও চাটাই ব্যবহার করত। মাটির তৈরীর তৈজসপত্রের ব্যবহার আধিক্য ছিল। স্বল্প সংখ্যক পরিবারে পিতল, তামা এবং লোহার তৈরীর তৈজসপত্রের আধিক্য ছিল। প্রত্যেক বাড়ীতে ঢেঁকি ছিল। মেজবান বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পাটির উপর দস্তরখানা বিছিয়ে অতিথি আপ্যায়ন করত। সনাতন ধর্মিরা পাটি বা চাটার উপর কলাপাতা বিছিয়ে অতিথি আপ্যায়ন করত।

ষাট দশকে গ্রামে নলকূপ ছিল হাতে গোনা কয়েটা। প্রায় সব পরিবার পান করা সহ সকল কাজের পুকুরের পানি ব্যবহার করত। ৬০ সালের ঘুর্ণিঝড়, ৬৩ ও ৬৮ সালেব বন্যার পর সরকার ত্রাণ হিসাবে আটা বিতরণ করলে, জনগণ আটা খেতে অভ্যস্ত ছিল না বিধায় অসন্তোষ প্রকাশ করত।

স্কুল পড়ুয়া বয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্য থেকে ৪০% ছেলে, ৫% মেয়ে স্কুলে যেত। ভিন্ন গ্রামে পড়তে গিয়ে অনেকে ঝড়ে পড়ত যা ১৯৬৮ সালে জুনিয়র স্কুল সম্মিলিত প্রচেষ্টায় হাই স্কুলে পরিণত হওয়ার পর অনেকাংশে রহিত হয়। ১৯৭০ সাল থেকে বেশ কয়েক বছর কদলপুর ছাত্র সমবায় সংঘ শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার মানোন্নয়নের জন্য বিনামূল্যে কোচিং করাত এবং পাশাপাশি উপস্থিত বক্তব্য ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করত। শিক্ষার্থীদের আর্থিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় ও গ্রামে কোন লাইব্রেরি না থাকায়, ১৯৭২ সাল থেকে কয়েক বছর ছাত্র সংঘ শহর থেকে বই কিনে এনে কোন প্রকার লভাংশ ছাড়া বিতরন করত।

ষাট দশকের প্রথমে সারা গ্রামে ৪/৫টি রিকশা ছিল। বাছির মোহাম্মাদ চৌধুরীর ঘাট দিয়ে সাম্পানে ৬ আনা খরচ করে শহরে যেত। ৭০ দশক পর্যন্ত কলেজ ভাসির্টির শিক্ষর্থিরা পায়ে হেঁটে পাহাড়তলি বা রাউজান গিয়ে গাড়িতে উঠে তাদের গন্তব্যস্থলে যেত। রাস্তায় সাইকেল চালাতে গিয়ে মুরব্বি দেখলে তাদের সম্মানার্থে সাইকেল থেকে নেমে যেত।

স্বাধীনতার পর নতুন উদ্যোমে সচেতন নাগরিক ও ছাত্ররা বিভিন্ন উন্নয়ন কাজে জড়িয়ে পড়ে যেমন- স্বেচ্ছাশ্রমে রাস্তা নির্মাণ, পরিত্যক্ত পুকুর সংস্কার করে মৎস্য চাষ, এক ফসলা জমিতে কয়েকটি ডিপ টিউবয়েল বসিয়ে তিন ফসলা জমিতে রূপান্তর করা।

গ্রামের পশ্চিম পার্শ্বে অনেক পাম্প মেশিন বসিয়ে অধিক জমি ইরি ধান চাষের আওতায় আনা হয় যেগুলোতে শুধু এক ফসল হত। পূর্ব পার্শ্বে ও পাহাড়ে চাষীরা উন্নতমানের আগাম শাক-সবজি উৎপাদন করে নিজেদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতে লাগল।

তখনকার সময়ে টাকা পয়সার কি মূল্য ছিল তা উপলব্ধি করার জন্য উক্ত সময়ের কিছু ঘটনা উল্লেখ করছি- ১৯৭২ সালে ছাত্র সমবায় সংঘ মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানার্থে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে পিকনিকের আয়োজন করে যেখানে প্রতিজনের চাঁদা ধার্য করা হয় ৪ টাকা। ১৯৭৩ সালে কক্সবাজার পিকনিকে খরচ হয় ১২১২.৫০ টাকা। যেখানে সবাই রাত্রিযাপন করি একটি স্কুলে। উক্ত স্কুলের শিক্ষক ছিলেন মরহুম সামশুল হুদা তালুকদার। পিকনিকে জনপ্রতি ১৫ টাকা চাঁদা হিসাবে মোট চাঁদার পরিমান ছিল ৭৫০ টাকা। মরহুম মুছা মিয়া চৌধুরী দেন ৩০০ টাকা এবং মরহুম মোজাম্মেল হক সাহেব দেন ১৫০ টাকা। ১৯৭৩ সালে ছাত্র সমবায় সংঘ কর্তৃক একটি সামাজিক নাটক মঞ্চস্থ হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন তৎকালিন গণপরিষদ সদস্য মরহুম জনাব আব্দুল্লাহ আল হারুণ সাহেব। উনি ২০০ টাকা চাঁদা দেন। নাটক শেষে ১৭৫ টাকা ঘাটতি পড়লে তা প্রধান শিক্ষক মরহুম জনাব সিরাজুল হক সাহেবের কাছ থেকে নিয়ে সমাধান করি। পরবর্তীতে উক্ত টাকা পরিশোধ করেন সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক আখতার আলম চৌধুরী।

৭০ দশকের মাঝামাঝি থেকে মানুষ মধ্যপ্রাচ্য যাওয়া আরম্ভ করল। একে অপরের সহযোগিতায় আস্তে আস্তে গ্রামের ৮৫% পরিবারের সদস্য মধ্যপ্রাচ্য গমনের পরিপ্রেক্ষিতে লেখাপড়া, ব্যবসা-বাণিজ্য তথা জীবনের মানোন্নয়ন হতে থাকে। এক কথায় গ্রামের সার্বিক উন্নয়নে প্রবাসীদের ভূমিকা অগ্রগণ্য। ১৯৭৭ সালে গ্রামের সর্বাঙ্গীন তথ্য সংগ্রহের জন্য কদলপুর সংসদ কর্তৃক একটি জরিপ সম্পাদন করা হয়।

৮০ দশকে এসে গ্রামের মেটো পথগুলো রাস্তায় পরিণত হয় এবং মাঝামাঝি সময়ে বিদ্যুৎ ও গ্যাস আসে। উল্লেখ্য যে, গ্রামে গ্যাস আসার ব্যাপারে অবদান ছিল তৎতকালিন মন্ত্রী জিয়াউদ্দিন বাবলু এবং বিদ্যুৎ আনার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল প্রগতি সংসদের। তাই প্রথম পল্লী বিদ্যুৎ পরিচালনা বোর্ডের সভাপতি হয়েছিলেন প্রগতি সংসদের প্রতিনিধি অধ্যক্ষ মোঃ আলী চৌধুরী। পর্যায়ক্রমে উন্নয়নের পরিধি বৃদ্ধি পেতে পেতে ২০১৬-২০২২ এর মধ্যে সর্বগুণে গুনান্বিত সাবেক অর্থ সচিব ও বর্তমানে বাংলাদেশের সিএজি মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব মু. মোহসিন চৌধুরীর বদান্যতায় গ্রামের রাস্তা সমূহ পিচ ঢালা হয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো ও স্বাস্থ্যখাতের আমূল পরিবর্তন হয়।



স্মৃতিপটে নানাবাড়ি

খালেদা বেগম চৌধুরী

কৈশোরে নানাবাড়ির স্মৃতি নেই এমন মানুষ বিরল। প্রতিটি মানুষেরই স্মৃতির পাতায় নানাবাড়ির বিচিত্র রকমের স্মৃতি নিজের অজান্তেই হৃদয়ে থরে থরে সাজানো থাকে। বয়সন্ধিকালের এই স্মৃতিগুলো নানাভাবে জীবনে উঁকিঝুঁকি দেয়। স্মৃতির মণিকোঠায় পরিপূর্ণ থাকে খেলার সাথীদের সাথে কাটানো হীরকখন্ডের মত জ্বলজ্বলে দিনগুলো।

রাউজানের কদলপুর গ্রামের ঐতিহ্যবাহী ও সম্ভ্রান্ত ফতেহ আলী চৌধুরী জমিদার বাড়িটি আমার নানাবাড়ি। নানাবাড়ির চিরসবুজ প্রকৃতি আঁকাবাঁকা মেঠো পথ, ধানক্ষেত, সবুজের সমারোহ প্রতিক্ষণেই আমাকে মুগ্ধ করতো। বিশাল দীঘির স্বচ্ছ জল, খেলার মাঠ, কারুকার্য খচিত মসজিদ আর শিউলি ফুলের গাছ। আষাঢ়-শ্রাবণের টানা বর্ষণের পর মেঘমুক্ত আকাশের অবারিত নীলে ঝিলমিল করতো শরতের দিনলিপি। যার সৌরভ ছাড়া অপূর্ণ থাকে শরতের আলপনা আঁকা, সে আর কিছুই নয়, শুভ্র শিউলি। সেই শিশির মাখা শিউলি ফুল ঘাসের উপরে মুক্তোর মতো দ্যুতি ছড়াতো। আমার নানা ছিলেন স্কুলের হেডমাস্টার। তিনি প্রথম আমাকে অক্ষরজ্ঞান দান করেন। সেই সুবাদে নানার স্কুলেই আমার পড়াশোনার পাঠ শুরু হয়। সাথে মসজিদে আরবীর পাঠও।

শিউলি কুড়িয়ে মালা গাঁথতাম। শীতের সকালে খেজুর গাছের গাছি মুন্সি বদ্দা রসের হাঁড়ি যখন গাছের নিচে রাখতো তখন চুটিয়ে আমরা সবাই মিলে হাঁড়ি নিয়ে বাড়িতে চলে যেতাম। মুন্সি বদ্দা গাছ থেকে নেমে আমাদের ধাওয়া করতো। দীঘির জলে সাঁতার কাটতাম। বেশি সময় পানিতে থাকতাম বলে নানাভাই পাথর ছুঁড়তো উঠে যাওয়ার জন্য। মামির হাতের রান্নার স্বাদ আহা! যেন আজো জিভে লেগে আছে। মুন্সি বদ্দার কাছ থেকে চুরি করা খেজুরের রসগুলো নিয়ে উনুনে দিয়ে গুড় বানাতাম, থালাতে পানি নিয়ে পানিতে গুড়গুলো ঢালতাম, তা শক্ত হয়ে যেত সবাই মিলে কটকটি বানিয়ে খেতাম। আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল, আমড়া, জাম্বুরা সব ফলের সমরোহ ছিল। আম গাছ থেকে আম পেড়ে ঝিনুক দিয়ে খোসা ছাড়িয়ে কলাপাতায় আমের ভরতা বানিয়ে খেতাম। বিকেলে খেলতে যেতাম বড় মাঠে। কানামাছি, ডাংগুলি, দাড়িয়াবান্ধা, ছি-বুড়ি, হাডুডু, কুতকুত, রান্নাবাটি, গোলাপফুল খেলায় নিত্যদিনের সাথী ছিল মামাতো ভাইবোনেরা। স্কুল ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ করে পুরস্কার পেতাম। সপ্তাহে দু'দিন হাট বসতো, নানার সাথে বাজারে গিয়ে সাজি ধরতাম, আর বায়না করতাম এটা-সেটা কেনার, নানা সব কিনে দিতো। আখের বাগান থেকে আখ কেটে দীঘির পাড়ে বসে খেতাম। বড় বড় ধানের ঘোলার নিচে হাঁসমুরগীর ঘর ছিল। সকালে কৃষকেরা ধান রেখে গেলে সেখান থেকে চুরি করে ধান বিক্রি করে মোয়ামুড়ি কিনে খেতাম। সেই যে মধুময় দিনগুলো মনে পড়লে চোখের কোণে আনন্দাশ্রু ঝরে। হায় দিন পুরাতনি। যেদিন গেছে সে দিনগুলো ভোলার নয়। যায় কী ভোলা।

আমার বড় নানা মরহুম সুলতান আহমদ চৌধুরী ও ছোট নানা মরহুম ফজলুল হক চৌধুরী আল্লাহ তাঁদের জান্নাতবাসি করুক। আমার নানার বাড়ি ছিল দোতলা মাটির গুদামঘর। এখন হয়েছে ইট পাথরের দালানকোঠা। কালের বিবর্তনে এখন অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আজকের সমাজে যাঁরা গুণী ও প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি হিসেবে শীর্ষ পদে অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁদের শুরুটা ছিল এ বাড়ি থেকেই। মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ সচিব ছিলেন, বর্তমানে সিএজি পদে নিযুক্ত আছেন। মু. মোহসিন চৌধুরী বিদ্যুৎ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব পদে নিযুক্ত আছেন। মোজাহেদুল ইসলাম চৌধুরী চট্টগ্রাম সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত আছেন। আমার মামাতো ভাইয়েরা যারা ছিল খেলার সাথী। খুশি আপা ও মুক্তা তাদের দু'বোন, মামা-মামী রত্নগর্ভা। এখানে তাঁদের নামে গড়ে ওঠেছে নুরুল আলম চৌধুরী- খালেদা বেগম কল্যাণ ট্রাষ্ট। গ্রামে মানসম্মত সুলভ মূল্যে ঔষধ সহজলভ্য করার উদ্দ্যেশে ট্রাস্টের পক্ষ থেকে একটি মডেল ফার্মেসি চালু করা হয়েছে। এই ফার্মেসি থেকে অর্জিত আয় দুঃস্থদের কল্যাণে ব্যয় হয়।

আমি ও জীবনের সাঁঝ বেলাতে। আমিও দোয়া প্রার্থী। জীবিত সবার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সাফল্য উত্তরোত্তর অগ্রগতি কামনা করছি। মুরব্বিরা কেউ বেঁচে নেই আল্লাহ সবাইকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করুন- আমিন।



আমার বাড়িতে, আমার স্মৃতি

মোঃ মনিরুল হক চৌধুরী

গত বছর বড়'দা (মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী) বললেন যে, 'বাড়ীর কাজ শেষ হলে একটা বড় করে গেট টুগেদারের আয়োজন করা হবে।' মনে মনে খুব আনন্দ পেলাম! সেই সাথে সিদ্ধান্ত হল- একটি স্মরণিকাও প্রকাশ হবে, সবাই লিখা দিতে পারবে, এতে আনন্দ আরো বেড়ে গেল। কিন্তু যখন বলল যে, লিখা ৫০০ শব্দের বেশি হতে পারবে না, তখন একটু খটকা লাগল। আমার বাড়িতে আমার কত স্মৃতি! তা কি এই ৫০০ শব্দের মধ্যে ব্যক্ত করা সম্ভব হবে? আমার আবার লিখার অভ্যাসও নাই। কোথা থেকে শুরু করে কোথায় শেষ করব, লিখা কেমন হবে এই নিয়ে মনের ভিতর অনেক জল্পনা-কল্পনা শুরু হল। এক এক বার এক এক রকম ভাবি। তবে নিঃসন্দেহে স্মরণিকাটি ফতেহ আলী চৌধুরী বাড়ির হাসি-খুশি-স্মৃতি-আনন্দের উপখ্যান ও কদলপুর গ্রামের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হতে চলেছে।

আমার জন্ম ১৯৯২ সালে। জন্মের পর থেকে এই ৩০ বছরে যা কিছু দেখেছি, বাবা-জেঠা-বড় ভাই-আত্মীয় স্বজনদের মুখে যা কিছু শুনেছি এবং চিঠিপত্র বিভিন্ন দলিল পত্রে যা কিছু পড়েছি সব কিছুই অনুপ্রেরণা মূলক। আমাদের বাড়িতে ছোটদের প্রতি বড়দের দায়িত্ব, কর্তব্য, স্নেহ, ভালোবাসা ও শাসনের যেমন কমতি নেই; তেমনি বড়দের প্রতি ছোটদের সম্মান, শ্রদ্ধাবোধ ও ভয়েরও ঘাটতি নেই। মা, বড়মা, চাচী-জেঠি তারাও কোন দিক দিয়ে কম না। আমার দাদারা চাচাত- জেঠাতো ভাই মিলে সাত ভাই যথাক্রমে মরহুম ওবায়েদুল্লাহ চৌধুরী, মরহুম গনি মিয়া চৌধুরী, মরহুম সুলতান আহমদ চৌধুরী, মরহুম সিরাজুল হক চৌধুরী, মরহুম আমিনুল হক চৌধুরী, মরহুম ফজল হক চৌধুরী ও মরহুম কায়েকোবাদ চৌধুরী। শুনেছি আমার দাদাদের নেতৃত্ব দিতেন শ্রদ্ধেয় মরহুম ওবায়েদুলা চৌধুরী। তার পরে মরহুম আলহাজ্ব আমিনুল হক চৌধুরী। দাদা মরহুম ওবায়েদুলা চৌধুরী সকলের জমি-জমা দেখবাল করতেন ও জমি কেনা-বেচার বিষয়ে সবাইকে শলা-পরামর্শ দিতেন। আশরাফ আলী চৌধুরী হাট সংলগ্ন এবাদত খানাটি তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। মরহুম আলহাজ্ব আমিনুল হক চৌধুরী অনেক বড় মাপের আলেম ও আল্লাহর ওলী ছিলেন। তিনি জীবিত অবস্থায় অনেক বড় বড় আলেম ও পীর মাশায়েখগণের পদচারণায় মুখরিত ছিল আমাদের বাড়ি। তিনি এই এলাকায় অত্যন্ত সম্মানী আলেম হিসেবে পরিচিত ছিলেন। এছাড়া তিনি চাকতাই, খাতুনগঞ্জের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হিসেবে সুনাম অর্জন করেছিলেন। তিনি কদলপুর হামিদিয়া সিনিয়র ফাজিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসার জমিদাতা ও প্রতিষ্ঠাতা। এই কদলপুর হামিদিয়া সিনিয়র ফাজিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসা থেকে পড়ালেখা শেষ করে অনেক ছাত্র প্রখ্যাত আলেম ও মুহাদ্দেস হয়ে দেশের বিভিন্ন মাদ্রাসায় শিক্ষা সেবা দিয়ে যাচ্ছেন।

আমার বাবা-জেঠারাও সাত ভাই। সবার বড় ছিলেন মরহুম আলহাজ্ব বদিউল আলম চৌধুরী। আমরা সবাই উনাকে বড় জেঠা বলে ডাকতাম। আমার বুদ্ধির বয়সে উনাকে দুইবার দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। উনি তৎকালীন কালকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে

বি.কম (অনার্স) পাশ করেছিলেন এবং হিসাবরক্ষণ অফিসের প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা হিসাবে কর্মরত ছিলেন। চাকরির সুবাদে তিনি ঢাকায় থাকতেন। তাঁর লালমাটিয়ার বাসাটি আমাদের আত্মীয়স্বজন ও এলাকার সবার কাছে ঢাকায় আশ্রয়স্থল হিসাবে বিবেচিত হত। আমাদের আত্মীয়স্বজন ও এলাকার মানুষ খুব কমই আছেন, যাঁরা তৎকালীন ঢাকায় গেছেন কিন্তু তাঁর বাসায় যাননি। তিনি সবসময় আত্মীয়স্বজন, বাড়ির ও এলাকার সকলের খবর রাখতেন। আমার বাবার কাছে তাঁর হাতের লিখা অনেক চিঠি পড়েছি। চিঠিগুলো যতই পড়ি ততই উনার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় মুগ্ধ হয়েছি। শুনেছি উনি যখন ঢাকা থেকে আসতেন সামনের দেউরিতে থাকতেন। আমার বাবা-চাচা-জেঠা, পাড়া-প্রতিবেশি ও অত্মীয়স্বজন বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে যারা তাঁর কাছে আসতেন। তিনি সবার কথা শুনতেন এবং পরামর্শ, নির্দেশনা ও সমাধান দিতেন। তিনি কদলপুর হামিদিয়া সিনিয়র ফাজিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসার সেক্রেটারি হিসাবেও সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বড় জেঠা তাঁর চাকরির সুবাদে অনেকের উপকার করেছেন এবং অনেকেই চাকরি পাওয়ার বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছেন। আমার বাবা-চাচা-জেঠারা সবাই উনাকে সর্বোচ্চ সম্মান করতেন। বাড়ির সব কিছুতেই উনার সিদ্ধান্তই সবাই মেনে নিতেন। আমার বড় জেঠা অনেক বড় মাপের মানুষ ছিলেন।

মেজ জেঠা আলহাজ্ব নুরুল আলম চৌধুরীকে খুব কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। খুবই নম্র, ভদ্র, শান্ত ও নির্ভেজাল মানুষ ছিলেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন ও আমাদেরকে নামাজ পড়ার তাগিদ দিতেন। অপচয় একদম পছন্দ করতেন না। ফজরের নামাজ পড়ে আসার সময় যদি ঘরের বাইরে লাইট জ্বালানো থাকতো দেখলে, বিদ্যুৎ অপচয় হচ্ছে দেখে আফসোস করতেন এবং আমার বড়ভাইদের বকা দিতেন। মেজ জেঠা ছিলেন প্রখর স্মৃতি-শক্তিসম্পন্ন একজন মানুষ! তিনি এলাকার ও পরিবারের একজন সার্থক-সফল অভিভাবক হিসাবে কদলপুর প্রগতি সংসদ কর্তৃক 'কৃতি অভিভাবক' স্বর্ণপদক ২০০৩-এ ভূষিত হয়েছিলেন। শিক্ষকতা জীবন শেষেও তিনি মাঝেমধ্যে মাদ্রাসাই ক্লাস নিতেন। আমি এমনও দেখেছি উনি রমজান মাসে খতমে তারাবির নামাজের সময় অনেক হাফেজদের কোরআন পড়ার ভুল শুধরে দিচ্ছেন। আমার সাথে ওনার খুব সুন্দর একটি স্মৃতি আছে। একদিন উনার কাছে পানি পড়া নিতে গিয়েছিলাম। উনি তখন আমি কোন ক্লাসে পড়ি জানতে চাইলেন। আমি বললাম- Eight, তারপর বললেন "Noun কাকে বলে"?, বললাম... আবার বললেন "Noun কয় প্রকার ও কি কি"? তাও বললাম। এরপর জিজ্ঞেস করলেন "Material Noun ও Abstract Noun এর পার্থক্য বল" আমি তো পরে গেলাম বিপদে! অবশেষে আমার এক ভাবি আমাকে কৌশলে বাচাঁলেন। এরপর আমি কখনো যদি দেখতাম আমার জেঠা আমাকে কোন প্রশ্ন করবে, তাইলে নানান অজুহাত দিয়ে পালিয়ে আসতাম।

মেজ জেটি মরহুমা খালেদা বেগম, আমরা ডম্মা (বড়মা) বলে ডাকতাম। আমার মেজ জেঠি সব কিছুতেই সতর্ক, সচেতন, জ্ঞানী, বুদ্ধিমতী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নারী ছিলেন। উনি কতটুকু পড়ালেখা করেছেন আমার জানা নেই। তবে উনার কাজ-কর্ম, কথা-বার্তা, আচার-আচরণ সব কিছুতেই শিক্ষা ও মার্জিত রুচির ছাপ ছিল। আমার মাকে বলতেন "পোওয়া-চা অক্কলরে দেইত পারিবের সময় দেইত পারিবে, মাইরোর সময় মাইর-- এনে ন চিয়ুন ছোয়া দি" (ছেলে-মেয়েদের আদরের সময় আদর, শাসনের সময় শাসন, চিকন বেত দিয়ে মাইর দিবা)। আমার জেটি মা আদর ও মায়ার সাগর ছিলেন। আমাদেরকে নাম দরে খুব কমই ডেকেছেন। সব সময় ডাকতেন 'অ-পুত, অ-জ্বি (আমার ছেলে, আমার মেয়ে)'। কোন একটি জিনিস দেওয়ার সময় সবাইকে এমনভাবে ভাগ করে দিতেন, কারো মন খারাপের সুযোগ ছিলনা। ছোট বেলায় আমি একবার আমার এক বড়ভাইকে ভুলে চাচা ডেকে ফেলছি, ওইটা শুনার সাথে সাথে উনি আমার পিছন পিছন এসে আমার আম্মুকে বলল "পুয়ারে হারে ভাই ডাকিবু, হারে চাচা ডাকিবু ন শিখ?" (কাকে ভাই ডাকবে আর কাকে চাচা ডাকবে শিখাওনি?) ওইদিন আমারও খুব লজ্জা লেগেছে। আমার মেজ জেঠি সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে ছিলেন। আমার মনে হয় মুসলিমভাই ও মহসিনভাইয়ের জীবনে উনার প্রভাব সবচেয়ে বেশি। আমার স্পষ্ট মনে আছে, উনি মারা যাওয়ার ঠিক দুই ঘন্টা আগে আমাদের পুরো উঠান সুন্দর একটি সুঘ্রাণে ভরে উঠেছিল। মুরব্বিদের মুখে শুনেছি কোন জান্নাতী মানুষের মৃত্যুর আগে তার রূহ নাকি পুরো বাড়ি ঘুরে বেড়ায়। আমার ডম্মা অত্যন্ত পরহেজগার মহিলা ছিলেন। বর্তমান যুগে এই রকম বহুমুখি প্রতিভার অধিকারী নারী খুব কমই দেখা যায়।

মরহুম ইদ্রিস মিয়া চৌধুরী (আমরা জেটা বাবা বলে ডাকতাম) আমার যখন একটু একটু বুদ্ধি হচ্ছে তখন তিনি মারা যান। । উনার সাথে আমার কিছু স্মৃতি আছে। উনি বার্ধক্যজনিত কারণে চোখে একটু কম দেখতেন। উনি যখন নামাজ পরে আসতেন তখন আমি দৌড়ে গিয়ে হাত দরে নিয়ে আসতাম। খাওয়ার সময় উনি আমার মাথা ধরে মুখ খুঁজে খাইয়ে দিতেন। যখন মাদ্রাসার বার্ষিক সভা হতো (মাদ্রাসার পুরস্কার বিতরণী ও মিলাদুন্নবী অনুষ্ঠান) তখন আমার জেঠা বাবা তার থলে থেকে বের করে সবাইকে দুই টাকা, পাঁচ টাকা করে দিতেন, কতোই না আনন্দ পেতাম। এখনও সভা হয়, কিন্তু ঐ রকম আমেজও নাই, আনন্দও নাই!

ডা. শফিউল আলম চৌধুরী- উনাকে আমার সবাই ডাক্তার জেঠা বলে ডাকি। এলাকায়ও ওনাকে ডাক্তার বলে চিনে। এলাকায় থাকাকালীন তিনি সমাজের গরিব-দুঃখী মানুষদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা সেবা দিতেন। চাকরির সুবাদে উনি বিভিন্ন এলাকায় ছিলেন বিধায় উনার সান্নিধ্য আমি তেমন পাইনি। কিন্তু যে কয়েকবার উনাকে দেখেছি বা কথা বলেছি, কত মায়া-ভালোবাসা তাঁর চোখমুখ দেখলে বুঝা যায়। বাবা-চাচা-জেঠাদের মধ্যে উনি এক মাত্র জীবিত অবস্থায় আছেন। বর্তমানে চট্টগ্রাম শহরে বহদ্দারহাটস্থত বাসায় থাকেন। আল্লাহ তাঁকে হায়াতে তৈয়বা দান করুক, আমিন!

মরহুম শাহ আলম চৌধুরী, আমার যতটুকু মনে পড়ে এই জেঠাকে আমি যখন দেখেছি তখন তিনি অসুস্থ অবস্থায় ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন। শুনেছি অত্মীয়স্বজন, এলাকাবাসী ও বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সাথে উনার আন্তরিক সম্পর্ক ছিলো। উনি খুবই পরোপকারী মানুষ ছিলেন। এলাকাবাসীর বিপদে সবসময় এগিয়ে আসতেন। নিজের জিম্মায় সুদে টাকা নিয়ে কত মানুষকে বিদেশ যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন তার হিসাব নেই। আমি এমনও শুনেছি নগদ টাকা না থাকায় স্বর্ণ বন্ধক রেখে অনেকের উপকার করেছেন। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তিনি অনেক মুক্তিযোদ্ধাদের খাইয়েছেন, আশ্রয় দিয়েছেন ও নানা প্রয়োজনে সাহায্য করেছেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট যখন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানকে স্বপরিবারে হত্যা করা হয়, এই খবর শুনে তিনি উঠানে গড়াগড়ি দিয়ে কেদেঁছেন। তিনি কদলপুর হামিদিয়া সিনিয়র ফাজিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসার সেক্রেটারির হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। মুরব্বির দেওয়া স্কুল, হাসপাতাল, মসজিদ ও মাদ্রাসার তদারকি করতেন।

মরহুম ইলিয়াছ মিয়া চৌধুরী আমার প্রিয় বাবা, শুধু আমার প্রিয় না পরিবারের সবার প্রিয়! আমার বাবা সমাজের সর্দার ছিলেন, মসজিদ, মাদ্রাসা ও স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও ইমাম গাজ্জালী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের গভর্ণিং বডির সম্মানিত সদস্য ছিলেন। দীর্ঘ ৩০ বছর ইউপি সদস্য ছিলেন, কয়েকবার ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানও ছিলেন। আমার বাবার মতো পর পর একাধিকবার নির্বাচিত মেম্বার ০৮নং কদলপুর ইউনিয়ন পরিষদে আর কেউ আছেন কিনা আমার জানা নেই। বিভিন্ন লোকের মুখে বাবার কত উপকারের কথা শুনেছি! আমাদের গ্রামের বেশির ভাগ মানুষই গরীব ও নিম্নবিত্ত। কত বিচার-সালিশ আমাদের ঘরে হয়েছে, তার কোন হিসাব নেই। সব বিচার-সালিশে দেখতাম দু-পক্ষের মধ্যে হই-হই-রই-রই চলত। আমার বাবা উভয় পক্ষের কথা শুনে শেষে দুই থেকে তিন লাইন কথা বলতেন। তার এই কথাগুলো শুনে পুরো পরিবেশ শান্ত হয়ে যেত। বিশেষ করে এলাকায় জায়গাজমির বিরোধ নিয়ে উনার কাছে সবাই আসতেন। উনি নিরপেক্ষ সমাধান দিতেন। এলাকায় উনার একটি কথায় অনেক জায়গাজমির বিরোধ সমাধান হয়ে গেছে। আমার বাবা ভীষণভাবে পরোপকারী মানুষ ছিলেন। আমি এরকমও দেখেছি তিনি নিজের টাকা দিয়ে অন্যকে জমি কিনে দিয়েছেন। তাঁর ব্যবহৃত আলমিরা ও টেবিলের ড্রয়ার খুলে মানুষের শত শত চিঠি ও চিরকুট দেখে মানুষের জন্য তাঁর অনেক উপকারের কথা জেনেছি। কত মানুষ তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে চিঠি লিখেছে, তাঁদের পরিবারের বিরোধ, স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ, আত্মীয়-স্বজনের বিরোধ, জায়গা-জমির বিরোধ ইত্যাদি মিমাংসা করে দিয়েছেন বলে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, সৌদি আরব, ওমান, আরব অমিরাত, বাহারাইন, কুয়েত ও কাতার এইসব জায়গা থেকে চিঠি বেশি আসত। আমার বাবা ছিলেন ঠান্ডা মাথার উদারপন্থি মানুষ। উনি কোন কিছুতেই বিচলিত হতেন না, আফসোসও করতেন না। এত সম্যাসার মধ্যেও বাবা এত বড় সংসার কেমনে টেনে নিয়ে গেছেন আমি ভেবে কুল পাই না! আমার বাবা সকল শ্রেণির মানুষের কাছে জনপ্রিয় ছিলেন। খুব মনে পরে বাবার মায়াভরা মুখের কথা, স্নেহ আর ভালোবাসার কথা, মুখে তুলে খাইয়ে দেওয়ার কথা, বুকে হাত রেখে ঘুম পারানোর কথা। বাবার কথা লিখতে গিয়ে হাত আমার কাঁপছে, মন আর প্রাণটা কেমন জানি করছে আর নিরবে চোখের কোণের জমা পানি মুখ বেয়ে পড়ছে। আমার ভাইবোন সবার মধ্যে বাবার প্রভাবটাই বেশি, থাকবেই না কেন, আমাদেরকে একটু ভালো রাখার জন্য কত খাটুনি না খেটেছেন। কখনো কোন বিষয়ে কারো কোন মাথা ঘামানো প্রয়োজন ছিল না। বাড়িতে কোন আত্মীয়স্বজন আসলে বাবা তাঁদের সাথে দেখা করতে সবসময় উৎসাহ দিতেন। "বলতেন তোর বদ্দা আইস্যি মাতাইয়ুস না ?" (তোমার বড় ভাই আসছে দেখা করছ?) দেরি করলে বলতেন "ইতেরা ঢাকারতুন বাড়িত আয় বই থাইক্কি, তোরা আইজু ঘুম জর" (ওরা ঢাকা থেকে গ্রামে আসছে আর তোমরা এখনো ঘুমাও), "আর আরার বদ্দা (বদিউল আলম চৌধুরী) আইলি দৌড়ি যাই মাতাইতাম যাইতাম, ইবের পিছনে পিছনে আইটতাম" (আমরা আমাদের বড়ভাই আসলে তাড়াতাড়ি উনার সাথে দেখা করতাম, উনার পিছনে পিছনে হাটতাম)। বাবা মানুষকে খাওয়ানো খুব পছন্দ করতেন। উনি সবসময় বলতেন "খাওয়ার দোয়া আগে"। মুরব্বিদের দেওয়া প্রতিষ্ঠান স্কুল, হাসপাতাল, এতিমখানা, এবাদতখানা, মসজিদ ও মাদ্রাসার সেবা করাই যেন তাঁর ধর্ম ছিল।

মরহুম আলহাজ্ব মাহবুবুল আলম চৌধুরী, উনি আমার বাবা-জেঠাদের মধ্যে সবার ছোট। উনি চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা ছিলেন। কদলপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের পরিচালনা পরিষদ এবং ইমাম গাজ্জালী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের গভর্ণিং বডির সম্মানিত সদস্য ছিলেন। উনি পারতেন না বা জানতেন না এই রকম কাজ খুব কমই ছিল! আমাকে অনেক মায়া করতেন আর মজার চলে কথা বলতেন। আমাকে বলতেন "তোর নাম কী ?" যদি বলতাম মনিরুল হক, উনি বলতেন "না ফজলুল হক", এমন ভাবে বলতেন আমি নিজেই নিজের নাম নিয়ে কনফিউজ হই যেতাম! আমি আমার এই চাচার মুখে শুনেছি, "আমরা এক ভাই জমি বিক্রী করতে গেলে শুধু জমির পরিমাণটা শুনেছি দলিল পড়েও দেখিনি স্বাক্ষর দিয়ে দিসি, ঐ লেভেলের আস্থা ও বিশ্বাস আমাদের ভাইদের মধ্যে ছিল"। উনি অনেক পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান ছিলেন।

তাছাড়া মনে পড়ে নাজমুন নাহার পলি- সেজভাবির কথা। খুব অল্পতে যে কারো সাথে মিশে যাওয়ার মতো দক্ষতা ছিল সেজভাবির। ভাবি হারানো শোক না কাটতেই অল্পবয়সে হারালাম প্রিয়ভাই আবু তাহের চৌধুরী টিপুকে। ভাইয়ের কথা খুব মনে পড়ে, মনে পড়ে তাঁর মায়া-মমতা-দায়িত্ববোধের কথা। একটু মেজাজি টাইপের হলেও তাঁর মনটা ছিল বিশাল, কখনো কোন কিছুর জন্য না করেননি। শুধু বলত "পড়ালেখা কর, যখন যা লাগে আমি দিব"! মাথার উপর থেকে ছায়াটা যেন সরে গেল। আরো রয়েছেন- ফয়েজ আহমদ

চৌধুরী। আমরা সবাই থাকে ফয়জ্জে বদ্দা বলে ডাকতাম। উনি সর্বদা হাস্য-রসাত্মাক কথা বলে সবাইকে মাতিয়ে রাখতেন। আমরা ভাইবোন সবাই ফয়েজ বদ্দা-সুফিয়া ভাবির অনেক আদর মমতা পেয়েছি। গোল বাহার বব্বু (বড় বোন) উনি প্রায়ই বছরে দুই-একবার আমাদের বাসায় নাইওর করতেন। উনার মুখে কত রাজা-রানী-জ্বীন-ভুতের গল্প শুনেছি! রাতে খেয়ে ঘুমানোর সময় সবাই উনার কাছে আবদার করতাম, এই কিচ্ছা-কাহিনী বলার জন্য। পাড়ার অনেক মানুষ আমাদের বাড়ির মুরব্বিদের অনেক সেবা দিয়েছেন। আমাদের লালন-পালন করেছেন, শাস্তি থেকে বাঁচিয়েছেন, লুকিয়ে লুকিয়ে কত কিছু খাইয়েছেন। তাঁরা হলেন মরহুম নুরুল ইসলাম, মরহুম ভোলা চৌকিদার, মরহুম আব্দুল মোমোন চৌকিদার, মরহুম আব্দুল ওয়াহাব, মরহুম আব্দুল রশিদ, মরহুম আব্দুর রহমান, মরহুমা আমেনা বেগম, মরহুমা হোছনে আরা বেগম, মরহুমা মমতাজ বেগম, মরহুমা আছিয়া বেগম, মরহুমা ছবুরা খাতুন প্রমুখ। তবে ছবুরা খাতুন আমার স্মৃতিতে অমলিন হয়ে থাকবেন। নাম না জানা অন্যান্যদেরকেও শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছি, তাঁদের ঋণ কখনো শোধ হবার নয়।

ছোটবেলা থেকে জানতাম বাড়ির ভাইদের মধ্যে সবার বড় মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী (সাবেক অর্থ সচিব ও বর্তমানে সিএজি)। পরে জানতে পারি আমার এক জেটাতভাই আছে ওয়াহিদুল আলম চৌধুরী নামে, উনি হলেন সবার বড়। উনার নাম আমি অনেকবার শুনেছি, কিন্তু দেখেছি মাত্র একবার, তাও জুম মিটিংয়ে একটি পারিবারিক গেট টুগেদারে। আমেরিকায় সেটেল হওয়ায় উনার বাড়িতে তেমন আসা হয় না । আমরা সবাই মুসলিমভাইকে বড় হিসাবে জানি। আমি জানি না মুসলিম চৌধুরীকে নিয়ে লিখার যোগ্যতা আমার আছে কিনা। তবুও কয়েক লাইন না লিখলে আমার লিখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। উনি আবার উনাকে নিয়ে লেখালেখি তেমন পছন্দ করেন না। মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী নামটার মধ্যে যেমন একটা বড় বড় ভাব আছে, দেখতেও তিনি বড়, মনটাও তাঁর শরীরের সমান বড়, জ্ঞানে তো আরো বড়। রাজনীতিবিদ, সরকারি আমলা, জনগণ ও সকল আত্মীয়স্বজনের কাছে তিনি সমানভাবে জনপ্রিয়। আমি ভাবি তিনি সৎ, পরিশ্রমী, নিস্বার্থ, নির্লোভ, নিরহংকারী, জ্ঞানী, পরপোকারী, জনগণ বান্ধব, দেশপ্রেমী! এত গুণের সমন্বয় একজন মানুষের মধ্যে কেমনে হয়..! তাঁর মধ্যে এলাকাবাসী, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব সবার সাথে সু-সর্ম্পক তো আছেই। বাড়ির উত্তর থেকে দক্ষিণ পার্শ্ব পর্যন্ত সবাই উনাকে বলে আর-বদ্দা (আমার ভাই), আর-চাচা (আমার চাচ্চু), আমার জেটা আব্বু! একজন মানুষকে কতটুকু ভালোবাসলে আমার মনে করা হয়! উনিও বাড়ির সবার বড় মুরব্বির থেকে সবার ছোট পিচ্চিটার নাম জানে। উনার দুষ্ট-মিষ্টি কথার ছলে, অমায়িক ব্যবহার, যা সব মানুষকে কাছে টানে। আমার মতে উনি এমন একজন মানুষ যাঁর পিছনে হাটলে অনেক কিছু শিখা যায়, যাঁর সাথে থাকলে সবসময় ভালো কিছু করার অনুপ্রেরণা পাওয়া যায়। আমার জীবনে সন্তুষ্টির সংজ্ঞাটা উনার কাজ থেকে পেয়েছিলাম। অর্থ সচিব হয়ে যখন প্রথমবার গ্রামে এসেছিলেন তখন আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম বড়ভাই সচিব তো হইছেন, এরপর কি হবেন ? উনি বলেছিলেন "একজন বিসিএস ক্যাডারের সচিব হওয়ার চাইতে বড় পাওয়া আর কি আছে"! আমি শুধু অবাক হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম! আমি সেইদিন অনুধাবন করতে পেরেছিলাম যে, একজন মানুষকে কতটুকুতে সন্তুষ্ট থাকা দরকার। বিভিন্ন বইয়ে পড়েছি একজন আদর্শবান নেতা, আদর্শবান আমলা, আদর্শবান বড়ভাই কেমন হওয়া দরকার, তার যদি বাস্তব উদাহরণ পেয়ে থাকি তাহলে এটি আমার বড়ভাই মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী। বাড়ির যেই যত বড় হোক না কেন, তাঁর সামনে আসলে সবাই ছোট হয়ে যায়, নম্র হয়ে যায়। উনি শুধু অমায়িক কথা বলেন তাই না, ভুল দেখলে বকাবকিও কম করেননা। উনার বকা খাইনি এই রকম মানুষ আমাদের বাড়িতে কম আছে। তবুও বদ্দার প্রতি কারো ভালোবাসার কমতি নেই, বদ্দা বাড়িতে আসবে বললেই যেন এক অন্যরকম আনন্দ। উনার সাথে স্মৃতির শেষ নেই, এলাকায় হাটা, মেজবানে যাওয়া, ঈদের সেলামী দেওয়া, কুরবানি ঈদে গরু কিনতে যাওয়া, ব্যাট-বল কিনার জন্য টাকা দেওয়া আরো কত কি। উনার কয়েকটি কথা আমার বেশি মনে পড়ে.. কেউ যদি বলে, বদ্দা আরা এক্কান চরি...(চাকুরি)। উনি বলতেন "চরি যেন আঁই ফাইলে ফাইলে রাইক্কি!" আর কেউ যদি এসএসসি এবং এইচএসসি পাশ করে সালাম করতে আসতো তখন জিজ্ঞেস করতো পয়েন্ট কত? যদি বলত পয়েন্ট একটু কম, তাহলে বলত" টট্টইশ্যে লেখাপড়া, এই লেখাপড়া-দি চরি ন অইবু"। আর উনি খেয়াল রাখেন কার চাকুরী হলে একটি পরিবার বেঁচে যাবে, তাকে ডেকে চাকুরী দিয়েছেন এমন অহরহ নজির রয়েছে। আমার মতে মুসলিমভাই আজ অবধি দেশ ও জনগণের কল্যাণে যা' কিছু করে যাচ্ছেন তার অনেক কিছুই বংশগত পাওয়া আর মুরব্বিদের দোয়া। মহান আল্লাহর কাছে লাখোকোটি শুকরিয়া এমন একজন মানুষকে আমাদের বংশে দিয়েছেন। আবারও শুকরিয়া জানাই এই মহৎ মানুষটিকে খুব কাছ থেকে দেখার, মেশার ও সহচার্য পাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

মেজভাই মু. মোহসিন চৌধুরী আসাধারণ একজন মানুষ। বাড়ির সবাই উনাকে মেজবদ্দা বলে ডাকি। উনার সাধ অনেক কিন্তু সাধ্য কম। আমার ভাই আপ্যায়নে সেরা, কোন মেহমান আসলে এইটা দাও, ওটা দাও, দেওয়ার কোন শেষ নাই। মানুষকে খাওয়াতে খুব পছন্দ করেন। আলহাজ্ব আমিনুল হক চৌধুরী এতিমখানা প্রতিষ্ঠায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সহকারী কমিশনার (ভূমি), রাঙ্গামাটি সদর, এনডিসি, রাঙ্গামাটি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার, টেকনাফ থাকাকালীন সময়ে সুনামের সাথে কাজ করে অনেক জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। পরবর্তীতে তিনি স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বর্তমানে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণলায়ের বিদ্যুৎ বিভাগে অতিরিক্ত সচিব হিসাবে সুনামের সাথে কাজ করে যাচ্ছেন। প্রবাসীরা প্রবাসে থাকাকালীন মারা গেলে সরকারের পক্ষ হতে যে আর্থিক সাহায্য পাওয়া যায়, তা এই এলাকার খুব কম মানুষই জানতো। উনিই প্রথম প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে থাকাকালীন এলাকায় সরকারের এই সাহায্যটি মৃত ব্যক্তির পরিবারের জন্য নিশ্চিত করেন। এলাকা তথা সমগ্র রাউজানের অনেক প্রবাসী

পরিবার এই সরকারি অনুদানের আওতাভুক্ত, যা এখনো চলমান। এলাকা, পাড়া-প্রতিবেশি, আত্মীয়স্বজনের যেই কোন কাজে তাঁর সাধ্যের মধ্যে সাহায্য আকাশ সমান। ছোটবদ্দা মোঃ মোজাহেদুল ইসলাম চৌধুরী। ছোটবেলায় উনি আমাকে ও অন্যান্যাদের নিয়ে খুব সুন্দর করে মিলিয়ে ছন্দ বলতেন, যা' এখনো খুব মনে পড়ে আর আনমনে হাসি। উনি একজন মেধাবী বড় মাপের আলেম, উনার ওয়াজ শুনে অনেক ভালো কাজে অনুপ্রাণিত হয়েছি, যা এখনো করি। বর্তমানে উনি ঐতিহ্যবাহী চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে নিয়োজিত আছেন।

আজ যে বাড়ির-ঘর সুন্দর করা হয়েছে তার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় ২০১৬ সালের শেষ দিকে। এটা একদিনে হয়নি এর জন্য মুসলিমভাই শ্রম ও সাধনা করে আসছেন অনেক আগে থেকে। গত ৫ বছরে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে সকলের। মুরব্বিদের আমলের পুরনো ঘরভাঙ্গা, লোনের ব্যবস্থা করা, আসবাবপত্র সরানো, পুরো বাড়ি পরিস্কার করা, দীঘি খনন, মাটি ভরাট আরো কতো কি! সবকাজ যেন এক সাথে। এইসব কাজ করতে যাঁর ঘাম ঝরানো পরিশ্রম হয়েছে তিনি হচ্ছেন প্রকল্পের পিডি শ্রদ্বেয় ভাই মোঃ খোরশেদুল আলম চৌধুরী। উনার তত্ত্বাবধানে সব কিছু হয়েছে। উনি অনেক চাপ নিয়েছেন, অনেক কিছু দেখাশোনা করেছেন। খোরশেদভাই সকল সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বাড়ির অন্যান্য ভাই মোঃ আলমগীর চৌধুরীর, মোঃ জানে আলম চৌধুরী, মোঃ ফখরুল আলম চৌধুরী, মোঃ দিদারুল আলম চৌধুরী, মোঃ ইউছুফ চৌধুরী, মোঃ রেজাউল করিম চৌধুরী, মোঃ এরশাদুল আলম চৌধুরী, মোঃ তৌহিদুল করিম চৌধুরী, মোঃ ইতেখারুল আলম চৌধুরী থেকে মতামত নিয়েছেন। সবকাজে তিনি সবার মতামত নিয়েছেন, সভা করেছেন ও সমন্বয় করেছেন। এই সবকাজে সার্বিকভাবে তদারকি করেছে ভাই ফাহিম উদ্দিন শাহ মন্টু। এই বাড়ির প্রতি উনার সম্মানবোধ, কৃতজ্ঞতাবোধ ও আন্তরিকতা দেখে আমি আবাক হয়েছি। এছাড়া ওপেল মামা বাড়ির সব কাজে ওতেপ্রোতোভাবে জড়িত ছিলেন। বদিউল আলম, সালাম, সারোয়ার, মাঈন উদ্দিন, সৌরভ, হেলাল, শহীদুল, বাপ্পি, এনাম, আবুল কালাম, লিটন, শাহাজাহান, বিল্লাল প্রমুখ বাড়ির বিভিন্ন কাছে সহযোগিতা করেছেন। মুসলিমভাই এখন ঐক্যর প্রতীক হিসাবে যেই কমপ্লেক্স নির্মাণ করছেন। তাঁর এই স্বপ্নটা আমার দাদা মরহুম আলহাজ্ব আমিনুল হক চৌধুরী স্বপ্ন দেখে গেছেন ১৯৩১ সালে! মরহুম আলহাজ্ব আমিনুল হক চৌধুরীর ১৯৩১ সালের চিঠিটা মুসলিমভাই হাতে পাওয়ার পর উনি আরো বেশি অনুপ্রাণিত হলেন, সাথে কাজের গতিও দ্বিগুণ হয়ে গেল। আস্তে আস্তে হয়ে গেল আমাদের স্বপ্নের কমপ্লেক্স। আমার বাড়িতে আমার স্মৃতির কথা আমি লিখে শেষ করতে পারব না, তবুও তো শেষ করতে হবে।

মহান আল্লাহ কাছে একটাই প্রার্থনা, আল্লাহ তুমি যুগে যুগে এই ঐতিহ্যবাহী ফতেহ আলী চৌধুরী বাড়িতে এমন কিছু মানুষ দিও যাঁরা বাড়ির নাম উজ্জ্বল থেকে আরো উজ্জ্বলতর করবে। সর্বশেষ ঐতিহাসিক, যুগান্তকারী, বিরল এক উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বাড়ির সকলের প্রিয়, শ্রদ্বেয়, সম্মানিত বড়ভাই জনাব মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী ও সার্বিকভাবে সহযোগিতাকারী সকল ভাইদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।





কদলপুরের কথামালা

প্রফেসর মোঃ আখতার আলম চৌধুরী

বাংলাদেশে আগেকার দিনে শহর বা নগর তেমন ছিলনা। গ্রামেই মানুষ বাস করত বেশী। গ্রামের লোকদের বাড়ীঘর থাকতো কাছাকাছি। গ্রামে ছিল নানারকম কুটির শিল্প। কামারেরা তৈরী করত লাঙ্গল, দা, কাস্তে ইত্যাদি; কুমোরেরা তৈরী করত হাঁড়ি, পাতিল; তাঁতিরা বুনতো কাপড়, কৃষকরা চাষের মাধ্যমে ধান, গম, শাক-সবজি ফলাতো। ফলে গ্রাম ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। গ্রামের রাস্তায় সাধারন মানুষ পায়ে হেঁটেই যাতায়াত করতো। নদীমাতৃক এই বাংলাদেশে যেখানে নদীপথ ছিল সেখানে নৌকায় যাতায়াত ছিল। গরুর গাড়ীর ব্যবহার ছিল মালামাল আনা নেয়ার জন্য, আবার দূরের যাত্রায়ও মানুষ গরুর গাড়ির ব্যবহার করতো। অভিজাত শ্রেণির লোকেরা ঘোড়ায় করে এবং ঘোড়ায় টানা গাড়িতে করেও চলাচল করতেন। বিভিন্ন স্থানে যাতায়াতের জন্য অভিজাত পরিবারের নারীরা পালকি ব্যবহার করতেন। রাজা ও জমিদারেরা ঘোড়ার গাড়ি ছাড়াও হাতিতে চড়ে ভ্রমণ করতেন। শিকার করার সময় ও লড়াইয়ে হাতির ব্যবহার প্রচলন ছিল। সভ্যতার ক্রমবিকাশে ধীরে ধীরে গ্রামের উন্নতি ঘটে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অনেক গ্রামের বিভিন্ন ইতিহাস আছে, স্মৃতি আছে। কিন্তু সময়ের সাথে কালের গর্ভে অনেক স্মৃতি অনেক ইতিহাস হারিয়ে যায় হয়তো বা লোকের অজান্তে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে অতীত গৌরবের স্বাক্ষী হয়ে। চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার কদলপুর তেমনি এক গ্রাম যা চট্টগ্রামের মুসলিম বিজয়ীদের গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতি বহন করে। কখন কিভাবে এ কদলপুর নামের উৎপত্তি বা সৃষ্টি ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই আমরা তা বুঝতে পারব। ইতিহাস থেকে জানা যায় মোহাম্মদ বিন তুগলকের আমলে ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ সোনারগায়ে নিজেকে স্বাধীন সুলতান হিসাবে ঘোষণা করেন। তিনিই ছিলেন চট্টগ্রাম বিজয়ী প্রথম মুসলমান শাসক।

ফখরুদ্দিন মোবারক শাহের চট্টগ্রাম বিজয়ের সময় (১৩৪০ খ্রীঃ) কদল খান গাজী ছিলেন তাঁর প্রধান সেনাপতি। তিনি চট্টগ্রাম অভিযানকালে রাউজান অঞ্চল দিয়ে গমন করেন এবং তথায় একস্থানে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। সে স্থান তাঁর নামে (কদলখান গাজীর) কদলপুর বলে খ্যাত হয়। বর্তমানে কদলপুর গ্রাম তাঁরই নামের স্মৃতি বহন করছে। এই সম্পর্কে বাংলাদেশ ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স (সাবেক পূর্ব পাকিস্তান ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স), চট্টগ্রাম-১৯৭০ এ উল্লেখ আছে:

When Fakhra become the independent Sultan of Sonargaon and assumed the title of Fakhruddin Mubarak Shah, he occupied Chittagong probably it was during the reign of Arakanee King Minhti. According to

tradition, Kadal Khan Ghazi (Kadal khan) was military officer and contemporary (who came with Mahiswar Baktear Siddiqui) of Fakhruddin, who conquered Chittagong. There is a village named kadalpur under Raozan Police Station. Maqtul Hussain a Bengali Book Written in 1654 records that Hazi Khalil and Badruddin Allama were engaged in preaching Islam in Chittagong about this time. Kadal Khan Ghazi met Hazi Khalil (a companion of Shah Jalal of Sylhet) and Bara Aulia (burried near Bhatiary Railway Station) and Allama Badruddin and honoured them.

"ফখরু সোনারগাঁয়ের স্বাধীন সুলতান হইয়া ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ নাম ধারণ করেন এবং চট্টগ্রাম দখল করেন। সম্ভবত ইহা ছিল আরকানী রাজা মিনহটির রাজত্বকাল। প্রচলিত মতে কদল খান গাজী (কদল খান) ছিলেন ছিলেন চট্টগ্রাম দখলকারী একজন সামরিক অফিসার এবং চট্টগ্রাম দখল করেন। সম্ভবত ইহা ছিল আরকানী রাজা মিনহটির রাজত্বকাল। প্রচলিত মতে কদল খান গাজী (কদল খান) ছিলেন চট্টগ্রাম দখলকারী একজন সামরিক অফিসার এবং ফখরুদ্দিনের সমসাময়িক ব্যক্তি (যিনি মহিসোয়ার বখতেয়ার সিদ্দীকের সহিত আসেন) রাউজান থানাধীন কদলপুর নামে একটি গ্রাম আছে। ১৬৫৪ সালে বাংলা ভাষায় লিখিত "মকতুল হোসেন" নামক পুস্তকের বক্তব্য থেকে জানা যায় হাজী খলিল এবং বদরুদ্দীন আল্লামা সেই সময়ে চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচারে রত ছিলেন। কদলখান গাজী হাজী খলিল, (সিলেটের শাহ জালালের অন্যতম সঙ্গী) বার আউলিয়া (ভাটিয়ারী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট সমাধিস্থ) ও আল্লামা বদরুদ্দীন প্রমূখ ব্যক্তিগণের সাথে সাক্ষাৎকার করেন এবং তাঁহাদের সম্মানে ভূষিত করেন।"

আমাদের এ কদলপুর গ্রামের অতীতে রাউজান খালের দক্ষিণ হতে মহামুনি অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে জানা যায়। এই প্রসঙ্গে এক বৌদ্ধ ভিক্ষু সম্বন্ধে বলা হয় "ছোটখাট ছাইঙ্গা ঠাকুর এত বুদ্ধি জানে, মহামুনির বৌদ্ধ মুর্তি কদলপুর আনে"।

চট্টগ্রাম জেলার একটি থানা রাউজান (বর্তমানে উপজেলা)। এই থানার প্রতিষ্ঠা নিয়ে বিভিন্ন তথ্য রয়েছে। আবদুল হক চৌধুরীর মতে ১৮৬০ সালে বৃটিশ সরকার শাসন কার্যের সুবিধার্থে হালদা নদীর পূর্ব দিকস্থ প্রাচীন হাটহাজারী থানার অংশের সাথে দক্ষিণের নোয়াপাড়া চাকলা যুক্ত করে রাউজান থানার সৃষ্টি করেন। ১৮৭৬ সালে (মঘীসন ১২৩৮) কবি আহমদ আলী মিয়া রচিত বড় তুফানের কবিতায়ও থানা হিসাবে রাউজানের উল্লেখ পাওয়া যায়। আমরা জানি ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজুদ্দৌলার পরাজয়ের পর বাংলার স্বাধীনতা অস্তমিত হয়ে যায় এবং বাংলা ইংরেজদের হাতে চলে যায়। ১৮৫৭ সালে ভারতবর্ষে সিপাহী বিপ্লব ঘটে। এখন দেখা যায় সিপাহী বিপ্লবের তিন বছর পর রাউজান থানার সৃষ্টি। আর কদলপুর গ্রামের নামের সৃষ্টি ১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দ, সে হিসাবে এটা অনেক পুরাতন অঞ্চল। তথ্যসূত্রে জানা যায় ফতেহ আলী চৌধুরীর প্রপৌত্র আশরাফ আলী চৌধুরী ১৮৮৫ সালে গ্রামে একটি পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করেন সেটি পরবর্তীতে কদলপুর হামিদিয়া প্রাইমারী স্কুলে পরিণত হয়। যা ছিল রাউজান থানা প্রতিষ্ঠার ২৫ বৎসর পর। ৩০ বৎসর পর ১৮৯০ সালে কদলপুর ওছমানিয়া প্রাইমারী এবং ১৯১৫ সালে কদলপুর প্রাইমারী প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

কদলপুর একটি গ্রাম, একটি ইউনিয়ন। বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রামের মতো কদলপুর গ্রামও অতীতে অবহেলিত ও সমস্যা জর্জরিত ছিল। কিন্তু তখন গ্রামের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে তেমন কোন প্রচেষ্টা ছিল না। বিশেষ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে কদলপুর খুবই অবহেলিত ছিল। পূর্বের জুনিয়ার হাই স্কুলের স্থানে পুরাতন অবহেলিত নামমাত্র একটি পাঠশালা ছিল। এটাকে ১৮৯০ সালে স্থানীয় গ্রামবাসী ও এলাকার শিক্ষানুরাগীদের প্রচেষ্টায় মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয় এবং ১৯১৭ সালে মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে (M. E. School) এ উন্নীত করা হয়। পরবর্তী ১৯৫০ সালে জুনিয়ার হাই স্কুলে উন্নীত করা হয়। দীর্ঘদিন এলাকায় কোন পুর্নাঙ্গ হাইস্কুল না থাকায় এলাকায় শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণ ব্যাপক বাধাগ্রস্থ হয়। ফলে আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও অনেকের মেট্রিক বা এস.এস.সি পাশের পূর্বেই লেখাপড়ার পরিসমাপ্তি ঘটে। এতে শিক্ষা ক্ষেত্রে গ্রাম পিছিয়ে পড়ে। উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী অনেকে আবার পার্শ্ববর্তী আর্য্যমৈত্রের হাই স্কুল ও রাউজান হাই স্কুলে গিয়ে লেখাপড়া চালিয়ে যায়, যদিও তাঁদের সংখ্যা ছিল খুবই নগন্য।

জুনিয়ার হাই স্কুলকে হাই স্কুলে পরিণত করার ওয়াদা কদলপুরের ইউনিয়ন বোর্ড/পরিষদ নির্বাচনে প্রচারণায় প্রাধান্য পেলেও নির্বাচনের পর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হতো না। জনশ্রুতি আছে ১৯৪০ সাল থেকে ৬ষ্ঠ-৮ম বার এই প্রতিশ্রুতি ব্যর্থতায় পরিণত হয়। ১৯৬৮ সালে কদলপুর গ্রামের ছাত্র যুবক ও সচেতন ব্যক্তি বর্গের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কদলপুর জুনিয়ার হাই স্কুলকে হাই স্কুলে উন্নীত করা হয়।

তখন থেকে এই স্কুল শিক্ষার আলো ছড়িয়ে এলাকার উন্নয়নে অবদান রাখছে। ইতিমধ্যে বর্তমান সিএজি মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব মু. মোহসিন চৌধুরী সহ এই বিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র ছাত্রী দেশের বিভিন্ন স্থানে গুরত্বপূর্ণ পদ অলঙ্কৃত করে কদলপুরের সুনাম বৃদ্ধি করেছে।

১৯৩৬ সালে কদলপুরের একমাত্র মাদ্রাসা কদলপুর হামিদিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা (বর্তমানে সিনিয়র দাখিল মাদ্রাসা) প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত মাদ্রাসা কদলপুরের সাধারণ মানুষ সহ চট্টগ্রামের বিভিন্ন থানার মানুষের ছেলেদের ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করতে তথা কোরআন শিক্ষা/নামাজ শিক্ষাসহ উচ্চতর ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

বর্তমানে রাউজান উপজেলায় শিক্ষিতের হার ৬৮.১৪%। ৭নং রাউজান ইউনিয়নে ৬৪.১৩%, ৮নং কদলপুর ইউনিয়নে ৭০%, ৯নং

পাহাড়তলী ইউনিয়নে ৬৯.৯২% ও ১০নং পূর্ব গুজরাই ইউনিয়নে ৭০.২৯%। এ তথ্য অনুসারে হিসেবে শিক্ষায় বর্তমানে কদলপুর অগ্রগামী।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৭২-৭৩ সালে আমরা কদলপুর ছাত্র সমবায় সংঘের মাধ্যমে কদলপুরে শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নের কাজে হাত দেই। ১৯৭৩ সালে আমরা কদলপুর গ্রামের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য সুন্দর হস্তাক্ষর প্রতিযোগিতা, রচনা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা ইত্যাদির আয়োজন করি। এছাড়া ২১শে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস, ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস ও ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস উপলক্ষে সারা দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হতো। এসব ছিল কদলপুর গ্রামের ব্যতিক্রমী আয়োজন, যা' অন্য কোন গ্রামে ছিল না। এছাড়া কদলপুরের বিভিন্ন প্রাথমিক ও হাইস্কুলে গিয়ে আমরা শিক্ষকদের সাথে আলোচনা করে তাঁদের গ্রামের শিক্ষার মানোন্নয়নে উদ্বুদ্ধ করতাম।

গ্রামের শিক্ষার মানোন্নয়নে ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে প্রগতি সংসদ কর্তৃক নির্ধারিত ফরমের মাধ্যমে এলাকায় জরিপকার্য পরিচালনা করা হয়। এই সার্ভের ভিত্তিতে শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নের কর্মসূচী নেওয়া হয়। এ সংস্থার নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচি থানা প্রশাসনসহ উর্ধতন কর্তৃপক্ষের প্রশংসা লাভ করে এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণে অবদানের জন্য কদলপুর জাতীয়ভাবে পুরস্কার লাভ করে।

কদলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য কদলপুর প্রগতি সংসদের মাধ্যমে তৎকালীন প্রধান শিক্ষক জনাব সিরাজুল হকের সাথে আলোচনা করে, আমরা এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে কিছু প্রস্তাবনা পেশ করি। বর্তমান সিএজি জনাব মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরীও এক বাস্তবমুখী ও সুন্দর প্রস্তাবনা আমাদের কাছে তুলে ধরেন। সে প্রস্তাবনাও আমরা প্রধান শিক্ষককে প্রদান করি। গ্রামের শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নের বিষয়ে ছাত্র জীবন থেকে জনাব মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরীর সক্রিয় ভাবনা পরিলক্ষিত হয়, তা আজ আরো বৃহৎ পরিসরে বিস্তৃত হয়েছে।

গ্রাম উন্নয়নের কাজে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে গ্রামের সংস্থা প্রগতি সংসদ তৎকালিন রাউজান দিশারী প্রকল্প ও কুমিল্লা প্রশিকা কেন্দ্রের সহযোগিতায় রাউজান থানার সমাজকল্যাণ সংস্থার কর্মীদের ওছমানিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে তিন দিন ব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে। রাউজান থানায় বিভিন্ন এলাকা ও ইউনিয়নের ৪৯টি সমাজসেবা সংগঠনের প্রায় ৫৫জন সমাজসেবা কর্মী এই প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। এটাই ছিল রাউজান থানা সদরের বাইরে গ্রামের প্রথম সমাজসেবীদের প্রশিক্ষণ। আজাদীর সম্পাদক অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

কদলপুরের ক্লাব/সমিতির ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১৯৪২ সালে কদলপুর পাবলিক লাইব্রেরী, ১৯৬০ সালে কদলপুর ইয়ংম্যান এসোসিয়েশন, ১৯৬২ কদলপুর ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, ১৯৬৩ সালে কদলপুর ছাত্র সমবায় সংঘ, ১৯৬৪ সালে কদলপুর সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, ১৯৭২ সালে কদলপুর সাংস্কৃতিক পরিষদ, কদলপুর সংঘ ও নবারুন সংঘ, ১৯৭৫ সালে কদলপুর প্রগতি সংসদ, ১৯৭৯ সালে কদলপুর আবহনী ক্রীড়া চক্র, কদলপুর ক্রীড়া পরিষদ ও রাউজান অনুসন্ধানী-কদলপুর, ১৯৮০ সালে কদলপুর মার্শাল ক্লাব, ১৯৯০ সালে কদলপুর উচ্চ বিদ্যালয় প্রাক্তন ছাত্র সমিতি প্রতিষ্ঠা হয়। এই সমস্ত ক্লাব-সমিতির অধিকাংশই সময়ের সাথে হারিয়ে গেছে।

ষাটের দশক থেকে কদলপুর গ্রামে কিছু সামাজিক সংগঠন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নাট্যানুষ্ঠান আয়োজন করতো। সে সময় মঞ্চস্থ নাটকের মধ্যে ঐতিহাসিক নাটক নবাব সিরাজুদ্দৌলা, টিপু সুলতান, উদয়নালা উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতার পর ১৯৮০ সাল পর্যন্ত দর্শনীর বিনিময়ে বিভিন্ন সংস্থা বেশ কিছু নাটক মঞ্চস্থ করে। ১৯৭৩ সালে কদলপুর ছাত্র সমবায় সংঘ কর্তৃক প্রথম সামাজিক নাটক 'জবাব দিহি' মঞ্চস্থ করা হয়। কদলপুরের দুয়েকটা নাট্যানুষ্ঠানে চলচ্চিত্র অভিনেতা পংকজ বৈদ্য, সুব্রত ও নায়িকা অঞ্জু ঘোষ অভিনয় করেন। এছাড়া কদলপুরের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিল্পী শেফালি ঘোষ ও শ্যাম সুন্দর বৈষ্ণব উপস্থিত থাকতেন। কদলপুরের কিছু প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সময়ের কবি গানের আসরের আয়োজন করত।

সাহিত্য ও লেখালেখিতে কদলপুর অনগ্রসর ছিল। কদলপুর প্রগতি সংসদ নামের সামাজিক সংগঠন ১৯৮০-৮১ সালে কদলপুরে প্রথম ম্যাগাজিন 'প্রগতি' প্রকাশ করে। কদলপুর উচ্চ বিদ্যালয় প্রাক্তন ছাত্র সমিতি ১৯৯২ সালে প্রথম স্মরণিকা 'অনুরণন' প্রকাশ করে পরবর্তীতে আরো কয়েকটি স্মরণিকা প্রকাশ করে। সর্বশেষ ২০১৮ সালে কদলপুর স্কুল এন্ড কলেজের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে 'অদম্য' নামে একটি বড় আকারের ম্যাগাজিন প্রকাশ করেছে।

আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি তখনকার দিনে গ্রামের রাস্তাঘাট ভাল ছিল না। ফলে কদলপুরের মানুষ বাছির মোহাম্মদ চৌধুরীর ঘাট হয়ে নৌকা করে শহরে যাতায়াত করতো। তখনকার দিনের প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক মোসলেম উদ্দীন হতে জানা যায় সিএজি মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরীর দাদা সুলতান আহমদ চৌধুরীরাও ফজরের নামাজের পর কয়েকজন মিলে হেঁটে বাছির মোহাম্মদ চৌধুরী ঘাটে গিয়ে সেখান থেকে সাম্পানে করে শহরে যেতেন এবং বিকালবেলা শহর থেকে ফিরে আসতেন।

সরকারীভাবে বৃক্ষ রোপন অভিযান শুরুর অনেক আগেই কদলপুরের অনেকে বৃক্ষ রোপনের কাজে নিয়োজিত ছিল। এরমধ্যে সিএজি

মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরীর পিতা মরহুম নুরুল আলম চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি সাপ্তাহিক ছুটি ও অন্যান্য ছুটিতে বাড়ী আসলে কমর আলী চৌধুরীর দীঘির পাড়ে, রাস্তার পার্শ্বে, বাড়ীর খালি জায়গায় বৃক্ষ রোপন করতেন। মরহুম নুরুল আলম চৌধুরী একজন সৎ, নীতিবান ও ধার্মিক মানুষ ছিলেন। ফলে তিনি গ্রামে থেকেও একটি আলোকিত ও সার্থক পরিবার গড়ে তুলতে সক্ষম হন। তাঁর ছেলেদের মধ্যে সিএজি মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব মুঃ মোহসিন চৌধুরী ও প্রফেসর মোজাহিদুল ইসলাম চৌধুরী তিনজনই বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তা। মৌলানা নুরুল আলম চৌধুরীর সার্থক পরিবার গড়ার স্বীকৃতি স্বরূপ কদলপুর প্রগতি সংসদের পক্ষ থেকে ২০০৩ সালের ২৪ মার্চ 'কৃতি অভিভাবক' হিসাবে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি দৈনিক আজাদীর সম্পাদক অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ জনাব নুরুল আলম চৌধুরীর হাতে 'কৃতী অভিভাবক স্বর্ণপদক' তুলে দেন।

আজকাল সমাজে সৎ ও ভালো মানুষের সংখ্যা কম। তাই আমি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সভা সমাবেশের বক্তব্যে বর্তমান সময়ের আমাদের এলাকার একজন সৎ, নীতিবান ও সার্থক অভিভাবক হিসাবে নুরুল আলম চৌধুরী এবং সৎ ও দেশপ্রেমিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হিসাবে সিএজি মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী ও অতিরিক্ত সচিব মু. মোহসিন চৌধুরীর নাম উল্লেখ করি। যাতে মানুষ সমাজ কল্যাণধর্মী কাজে উদ্বুদ্ধ হয়।

কদলপুরের সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ করে কাপ্তাই রাস্তার পাহাড়তলী থেকে রাউজান জলিল নগর পর্যন্ত হাফেজ বজলুর রহমান সড়ক উন্নয়নে, কদলপুর স্কুল ও কলেজের উন্নয়নে. কদলপুর আইডিয়াল হাই স্কুল প্রতিষ্ঠায় ও উন্নয়নে এবং কদলপুর গ্রামের রাস্তার উন্নয়নে সিএজি জনাব মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরীর উদ্যোগ ও অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

জনাব মু. মোহসিন চৌধুরী ও উনার অগ্রজের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কদলপুরের আত্মসামাজিক উন্নয়নে অবদান রেখে চলেছেন। তাঁর অবদানও কদলপুরবাসী চিরদিন মনে রাখবে।

বর্তমানে 'নুরুল আলম চৌধুরী -খালেদা বেগম কল্যাণ ট্রাস্ট' এর মাধ্যমে এ পরিবার কদলপুরের মানুষের জন্য বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। এতেও এলাকার মানুষ নানাভাবে উপকৃত হচ্ছে।

সময় ও নদীর স্রোত এগিয়ে চলে। আমাদের জীবনও সময়ের সাথে এগিয়ে যাচ্ছে। মানব জীবনের সময় অনেক ছোট। তাই জীবনের ছোট সময়কে সঠিকভাবে মানব কল্যাণে ব্যবহার করতে পারলেই আমাদের মানুষ হিসাবে জন্মগ্রহণ সার্থক বলে গণ্য হবে। আসুন আমরা দেশের কল্যাণে ও মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখি।

তথ্য সূত্রঃ

১। সাবেক পূর্ব পাকিস্তান ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স, চট্টগ্রাম ১৯৭০

২। বিভিন্ন পত্র পত্রিকা/ম্যাগাজিন

লেখকঃ

প্রফেসর মোঃ আখতার আলম চৌধুরী

প্রাক্তন প্রিন্সিপাল, বিজিসি একাডেমী (স্কুল এন্ড কলেজ) বিদ্যানগর, চট্টগ্রাম এবং

প্রাক্তন ভাইস-প্রিন্সিপাল, সরকারী সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম।

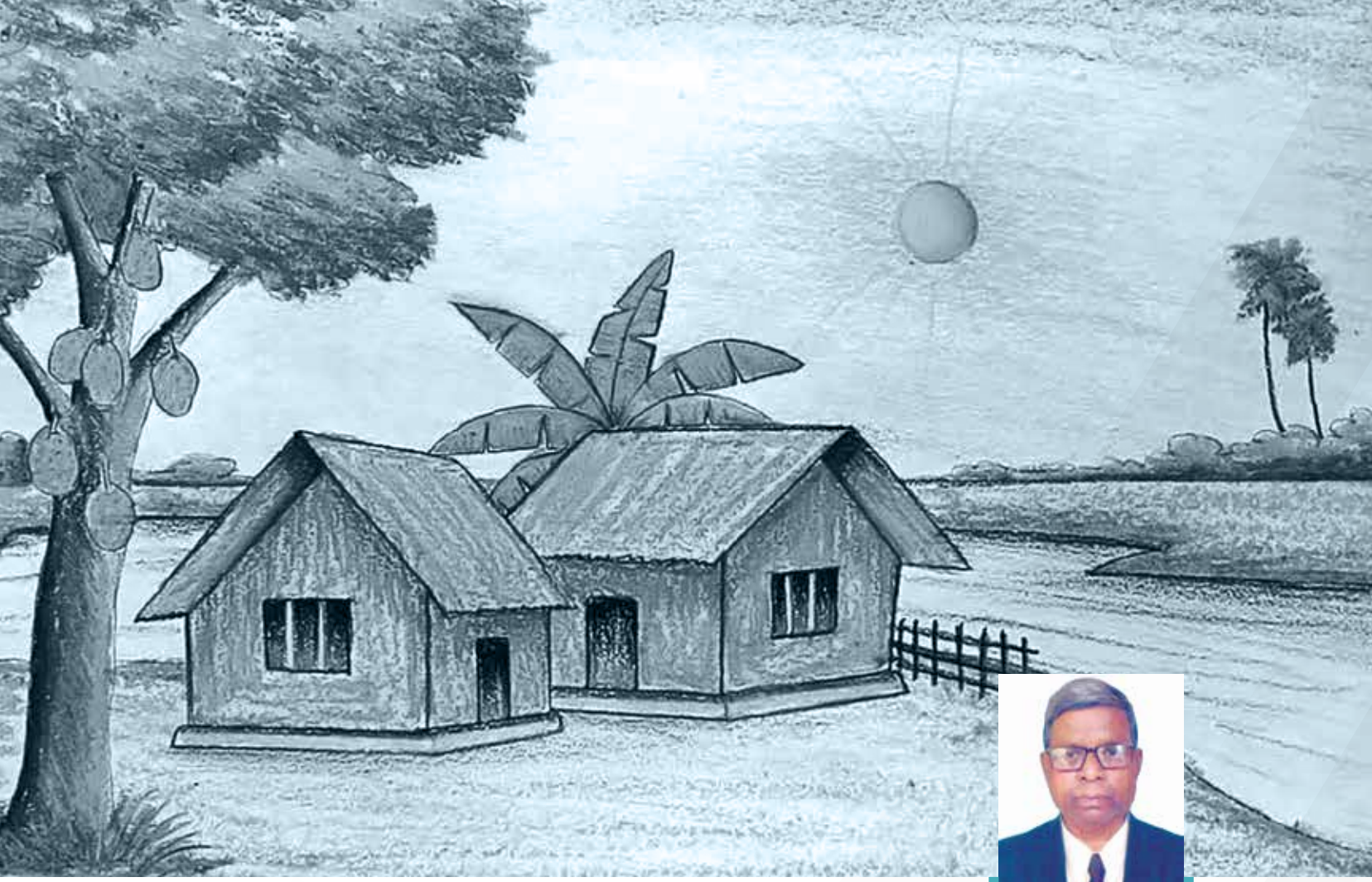

নুরুল আলম চৌধুরী - খালেদা বেগম কল্যাণ ট্রাস্ট

কদলপুরের দিগন্তে জনকল্যাণের নব সূর্যোদয়

অধ্যাপক বাদল কিশোর দাশ

দেশে ক্লাব-সমিতি-সংঘের কোন অভাব নেই। এ ধরনের সংগঠন নিমিষেই জন্মলাভ করে আবার অল্প সময়ের ব্যবধানে অস্থিত্বের সংকটে পড়ে। কিন্তু ট্রাস্ট? তাও যদি হয় জনহিতকর ও জনকল্যাণের মহৎ উদ্দেশ্যে গঠিত। সংখ্যায় প্রচুরের কথা দুরে থাক খুঁজলেই ২/১ টির দেখা মেলে। কারণ ক্লাব-সমিতি সংঘের উদ্দেশ্যের সাথে ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে যোজন যোজন ফারাক। সংখ্যার বিচারে কদলপুরের ক্ষেত্রেও এটি সত্য। বোধগম্য কারণে নিষ্ক্রিয় সংগঠনের উদাহরণ উল্লেখ না করাই উত্তম।

উন্নত ডিজিটাল তথ্য প্রযুক্তির বদৌলতে গোটা বিশ্ব আজ একে অপরের নিকট থেকে নিকটতর স্থরে চলে এসেছে। মূহুর্তেই পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে মানুষে মানুষে যোগাযোগ স্থাপন আজ অতি সাধারণ ঘটনা। গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে পর্যন্ত মানুষ যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এই উন্নত প্রযুক্তি তথা বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার সাথে সঙ্গতি রেখে মানুষের মনোজগতের অগ্রগতি ঘটছে কই? আজ মানুষে মানুষে মানবিক মূল্যবোধ, সহমর্মিতা, মানবিকতা, আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, শিষ্টাচার ইত্যাদি মানবিক গুনাবলীর তীব্র অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে কেন? উন্নত দেশগুলোতেও সাম্প্রদায়িক হানাহানি, বর্ণবাদের বিষাক্ত ছোবলে মানুষ জর্জরিত হচ্ছে কেন? মানুষ হয়ে মানুষকে অত্যাচার নিপীড়ন নির্যাতন হত্যা, শোষন তথা নিষ্ঠুরতা নির্মমতা পাশবিকতার মতো অপরাধ প্রবনতার দুঃসংবাদ এত বৃদ্ধি পাচ্ছে কেন? তাহলে কি এত উন্নত প্রযুক্তি মানুষের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ, সামাজিক দায়বদ্ধতা সহনশীলতা ইত্যাদি গুনাবলী জাগ্রত করতে চরমভাবে ব্যর্থ? প্রযুক্তির এই চরম ব্যর্থতা পুষিয়ে মানবিক গুনাবলীর উৎকর্ষ সাধনসহ নানাবিধ জনকল্যাণে জোড় কদমে এগিয়ে আসতে পারে আজকের কদলপুরের নুরুল আলম চৌধুরী - খালেদা বেগম কল্যাণ ট্রাস্টের মতো ব্যতিক্রমধর্মী শতভাগ জনকল্যাণমুখী সংগঠন।

এমনি এক যুগ সন্ধিক্ষণে 'জনহিতকর কর্মকান্ড পরিচালনা, মূল্যবোধ ও সামাজিক দায়বদ্ধতা জাগ্রত করা, বর্তমান প্রজন্ম ও পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে মানব কল্যাণে সকলকে অধিকতর সম্পৃক্ত করা' ইত্যাদিই শুধু ট্রাস্ট গঠনের উদ্দেশ্যেই নয়, এগুলি একান্তভাবেই সময়ের দাবীর প্রতিফলন মাত্র। এ দাবীসমূহ ছাড়াও আরও নানাবিধ জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ড যে ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব থেকেই ট্রাস্টের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও উদ্যোক্তাগণ শ্রদ্ধেয় মরহুম নুরুল আলম চৌধুরী, খালেদা বেগম দম্পতির তথা রত্নাগর্ভা মায়ের রত্ন সন্তানদের ঐকান্তিক আগ্রহ ও নিরলস প্রচেষ্টায় পুরো গ্রামব্যাপী পরিচালিত হয়ে আসছে, তা' দিবালোকের মত দৃশ্যমান। আমাদের অহংকার এই ভ্রাতৃদ্বয় (মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী ও মু. মোহসিন চৌধুরী) জনহিতকর ও জনকল্যাণের যে আলোকবর্তিকা বর্তমান সচেতন প্রজন্মের হাতে তুলে দিতে সক্রিয় রয়েছেন, তা' সুন্দর ও সুষ্ঠভাবে এগিয়ে নিতে পারলেই ট্রাস্ট গঠনের উদ্দেশ্য সর্বাংশে সফল ও সার্থক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

গল্প নয় সত্য :

চলতি সালের প্রথম দিকের ঘটনা। প্রতিদিনের মতো আজও পাহাড়তলী থেকে এক ১৫/২০ বছর বয়সী চালকের গাড়ীর যাত্রী হয়েছি। সিএনজি'তে আসনসংখ্যাগুলো অনুযায়ী যাত্রী পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য খানিক অপেক্ষা করতেই হয়। শেষ যাত্রীটি জানিয়ে দিল তিনি কদলপুর হামিদিয়া মাদ্রাসার একটু আগে নামবেন। চেঁচিয়ে উঠল তরুণ চালক। মাদ্রাসার আগে কেন? সচিবের বাড়ী, সচিবের ঘাটা এটা বলতে পারতেছেন না? পঞ্চাশোর্ধ ব্যক্তিটি জবাব দিল ওটা ফতেহ আলী চৌধুরীর বাড়ী। চালক ছেলেটি স্বভাবসুলভভাবে আরও উচ্চস্বরে লোকটির মুখের উপর আঞ্চলিক ভাষায় জবাব দিল। নতুন নাম শিখাইতে আসছেন? আপনার বাড়ী কোথায়? নিশ্চয়ই কদলপুরে নয়। কদলপুর হলে এইরকম নতুন নাম উচ্চারণ করতে পারতেন না। তাদের চেঁচামেচিতে আরও কয়েকজন চালক এবং তৃতীয় ব্যক্তিরা এসে জড়ো হল। তাদের নেতা বা লাইনম্যান জাতীয় একজন তর্কে জড়িতদের থামিয়ে দিয়ে বিজ্ঞ ভঙ্গীতে সিদ্ধান্ত দিল- চালক ছেলেটির দাবি সঠিক। আগে পুরানো যাই থাক ঐটা এখন সচিবের বাড়ী এবং সচিবের ঘাটা হিসাবেই পরিচিত। লাইনম্যানের সিদ্ধান্তের সহিত সহমত পোষণ করে সকলেই নিশ্চুপ। অসুস্থতা নিয়ে আমি আগে থেকেই নীরব। ঐ যে কথায় বলে "ধর্মের ঢোল আপনি বাজে"।

চালক ছেলেটির বিড়বিড় করা কিন্তু বন্ধ হয়নি। সে বলেই যাচ্ছে আমার বয়স যা হয়েছে জন্ম থেকেই শুনে আসছি ওটা সচিবের বাড়ী। এই রোডের সব ড্রাইভার এবং এলাকার সব মানুষের এতে কোন দ্বিমত নেই। জানেন এই রাস্তা চওড়া করা, পোল (ব্রীজ) বড় করা, নতুন নতুন ব্রীজ নির্মাণ করা এসব কার অবদান? গাড়ী ততক্ষণে কদলপুর স্কুল এন্ড কলেজের সামনে এসে পৌঁছেছে। কি মনে করে সে একটু পাশ কেটে গাড়ী থামিয়ে দিল। লোকটিকে নিশানা করে বলতে শুরু করল জানেন- ওই স্কুলে কয়টা বিল্ডিং ছিল এই সেদিনও। আর আজ ৯/১০ টার কম নয়, পেছনেরগুলো তো দেখা যাচ্ছে না-ওই সবগুলি সচিবের মাধ্যমেই এসেছে। অথচ আপনি না জেনে না বুঝে কোথাকার কি নাম বলতেছেন। আমাকে এখানেই নামতে হবে, তাই নেমে গেলাম। একটু সুযোগ পেয়ে চালক ছেলেটির উদ্দেশ্যে সাহস করে যোগ করলাম ঐ প্রবীন ব্যক্তির উক্তিই ঐতিহাসিকভাবে সঠিক। তবুও ছেলেটি মাথা নাড়াচাড়া করতেছে না-বোধক ভঙ্গিতে। কদলপুরের ঐতিহ্য-ইতিহাস জ্ঞান তাদের সীমিত। আজকের দৃশ্যমান বাস্তবতাটাই প্রধান তাদের কাছে।

সরল সাধারণ গ্রামের বর্তমান প্রজন্মের প্রতিনিধি যেন ওই চালক ছেলেটি। গ্রামে সচিব সাহেবদের অবদান সম্পর্কে যথেষ্ট খবর তারা রাখে। সব সূচকেই বিশেষ করে যোগাযোগ-শিক্ষা ব্যবস্থাসহ সব কিছুতেই ওনাদের অবদান তাদের চোখ এড়ায় না। আরও কিছুক্ষণ তার সহিত সময় ব্যয় করতে পারলে হয়ত গ্রামের অসংখ্য যুবক-যুবতীদের সরকারি কর্মসংস্থান, গ্রামের আনাচে-কানাচে পীচঢালা রাস্তা, খাল-দিঘী পুকুরের পুনঃখনন ও সংস্কার, মসজিদ মন্দিরে অনুদান ইত্যাদি নানাবিধ জনহিতকর কর্মকান্ডের ব্যাপারে সম্মানিত সচিবদের অবদান সম্পর্কে আরও অনেক তথ্য পাওয়া যেত। যা আমার মতো অনেকেরই হয়ত অজানা। সিএনজি চালকের বাচনভঙ্গীতে বুঝা গেল ওরা এই কৃতি ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ সহকারে কত উচ্চধারণা লালন করে। সাথে রয়েছে এই রকম গুণী মানুষের একই গ্রামের বাসিন্দা হিসাবে আত্মতৃপ্তি ও অহংকারবোধ। তাই এই বিশাল জনগোষ্ঠীর এই ধরণের মনোভাব প্রত্যক্ষ করে আমাদেরও অহংকার গৌরব ও আনন্দের জায়গাটা বহুলাংশে বেড়ে যায়। এতসব জনহিতকর বহুমুখী উন্নয়নের পেছনের সুদক্ষ কারিগরদের দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্যের জন্য তাদের সহিত আমাদেরও অন্তরের অন্তস্থল থেকে অবিরত নির্গত হয় অকৃত্রিম দোয়া।

অন্যান্য কিছু প্রসঙ্গ :

২০১৭ থেকে ২০২২ একটি ট্রাস্টের জন্য আর কতটুকুই বা সময়। এরই মধ্যে কোভিড-১৯ এর ছোবলে প্রায় দু'বছর তো সব রকমের বিশেষ করে সামাজিক জনহিতকর কর্মকান্ড তো একেবারেই স্থবির হয়ে পড়ে। আলোচ্য কল্যাণ ট্রাস্টের গৃহিত কর্মসূচীও এর ব্যতিক্রম নয়। অর্থাৎ সঙ্গত কারণে ট্রাস্টের গৃহিত কর্মসূচী বাস্তবায়ন বিঘ্নিত হওয়া সহ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়াটাই খুব স্বাভাবিক। তথাপিও এরই মধ্যে ট্রাস্টের জনকল্যাণ মূলক কর্মকান্ড সর্বমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ ও প্রশংসা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এর বিস্তৃত বর্ণনা না দিয়ে ২/১ টি উদাহরণ নিম্নে তুলে ধরা নিশ্চয়ই অযৌক্তিক হবে না।

জরাজীর্ণ শৌচাগার ভেঙ্গে সম্পূর্ণ ট্রাষ্টের অর্থায়নে আধুনিক সুযোগসুবিধা সম্বলিত মেয়েদের জন্য কদলপুর স্কুল এন্ড কলেজে ২০১৮ সালে

ওয়াশব্লক নির্মাণ উল্লেখযোগ্য। সেখানে অন্যান্য পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধাসহ প্রতিবন্ধিদের জন্য আলাদা কক্ষের ব্যবস্থা পর্যন্ত রাখা হয়েছে।

ট্রাষ্ট গঠনের পরপরই গ্রামের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ট্রাষ্টের উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইউনিফর্ম বিতরণ করা হয়েছে, দেয়া হয়েছে মেধাবৃত্তি। এসব শিক্ষাবান্ধব নানা কর্মসূচী চলমান রয়েছে ও থাকবে।

ট্রাষ্টের উদ্যেগে স্থানীয় বাজারে মানসম্পন্ন ঔষধ সহজলভ্য করতে পরিচালিত হচ্ছে হেলথ কিউর ফার্মেসী কাম ডিপার্টমন্টোল সেন্টার। এই মডেল ফার্মেসীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটিও ছিল গ্রামীণ জনপদের জন্য একটি স্মরণীয় প্রাণবন্ত অনুষ্ঠান। মানুষ জানতে, বুঝতে পেরেছিল কি এক মহামূল্যবান অলাভজনক অথচ বিরাট জনকল্যাণমূলক শুভ উদ্যোগের সূচনা হয়েছে। জনগনের সুস্বাস্থ্য রক্ষার্থে ট্রাস্টের সম্মানিত উদোক্তাগণ ও কর্মকর্তাদের চিন্তাভাবনা কতই সুদূরপ্রসারী। চিকিৎসকসহ ঔষধ ও জরুরি চিকিৎসা সামগ্রীর সহজলভ্যতা, ঔষধের সঠিক মান ও সঠিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণ, অনুর্ত্তীন মেয়াদসহ জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সুলভ মূল্যে সরবরাহ ইত্যাদির সার্বক্ষণিক সুফল গ্রামে দোরগোরায় পাচ্ছে মানুষ। এই মহৎ উদ্যোগ যে কতটা যুগপোযোগী তা' বর্ণনাতীত। অন্যদিকে এরই সুবাদে কয়েকজনের কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি হয়েছে।

প্রসঙ্গত আরেকটি ছোট্ট উদাহরণ অথচ উল্লেখযোগ্য স্মৃতিঃ

কদলপুর প্রগতি সংসদের উদ্যোগে সমাজসেবা, শিক্ষকতা, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য গ্রামের শ্রেষ্টজনদের বিশেষ সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান। স্থান- কদলপুর হামিদিয়া মাদ্রাসা হল। তারিখ, সাল সবই বিস্মৃতির অন্তরালে। বক্তব্য প্রদানের পালা। এক পর্যায়ে বক্তৃতা প্রদানের জন্য উচ্চারিত হল আজকের শ্রদ্ধেয় মরহুম নুরুল আলম চৌধুরীর নাম। বক্তৃতা যে তিনি শুরু করলেন থামার কোন লক্ষণ নেই। দেশের সমাজের নানা অসঙ্গতি নিয়ে অর্নগল বলে যাচ্ছেন। দুটি হাত মুষ্টিবদ্ধভাবে শক্ত করে লাঠির অগ্রভাগে ধরা। তাঁর মুখটি যে বারবার স্পিকার থেকে এদিক ওদিক যাচ্ছিল সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই, কে থামায় তাঁকে। অবশেষে এশার নামাজের আজানের শব্দে তিনি নিজেই ক্ষান্ত হলেন। সত্য ন্যায়ের পক্ষে কথা বলার ক্ষেত্রে এই বার্ধক্য বয়সেও তিনি যে কতটা দৃঢ়চেতা, স্পষ্টবাদী ও নির্ভিক ছিলেন-- আলোচ্য ঘটনাটি তারই একটা ইঙ্গিত মাত্র।

উপসংহারঃ

ট্রাষ্ট গঠনের এত কম সময়ের ব্যবধানে একটি স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগও যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে নিসন্দেহে। ট্রাষ্টের উদ্যোগ ব্যতিরেকে ট্রাষ্ট প্রতিষ্ঠার বহু আগে থেকেই দেশ ও দশের পরম হৈতেষী এই কৃতি ভ্রাতৃদ্বয় গ্রামের ও গ্রামের আপামর মানুষের, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে অনানুষ্ঠানিকভাবে যা করেছেন ও অদ্যাবধি করে যাচ্ছেন-- তা সর্বমহলে উচ্চমাত্রায় সদা-সর্বদা প্রসংশিত। সর্বস্তরের মানুষের ঘরে ঘরে তাঁদের বদান্যতার সুফল পৌঁছে গেছে ইতিমধ্যেই। পুরো এলাকা থেকে অহর্নিশি তাঁদের উপর দোয়া বর্ষিত হচ্ছে। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রামের সুধীজন ও বর্তমান প্রজন্মের সম্ভাবনাময় তরুণদের আন্তরিক সহযোগিতায় আগামীদিনে ট্রাষ্টের কর্মপরিধি দেশ ও দশের কল্যাণে আরও বহুদুর এগিয়ে যাবে- এই হোক আমার-আপনার-সকলের প্রত্যাশা।





কদলপুর হামিদিয়া মাদ্রাসার ইতিবৃত্ত

মরহুম অধ্যক্ষ মাওলানা জহুর আহাম্মদ

পীর আউলিয়ার পূর্ণস্থান কদলপুর। তারই ধারাবাহিকতায় এই গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কদলপুর হামিদিয়া সিনিয়র (ফাজিল) মাদ্রাসা। প্রতিষ্ঠানটি রাউজান তথা চট্টগ্রামে ইসলামী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সু-প্রাচীন। ১৯৩৬ সালে কদলপুর গ্রামে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে জমিদার শেখ ফতেহ আলী চৌধুরীর বংশধর শেখ নুরুল হক চৌধুরীর পুত্র আলহাজ্ব আমিনুল হক চৌধুরীর অবদান ছিল অবিস্মরণীয়। এটি প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি সকলকে সংগঠিত করে একটি আলোচনা সভা করেন। উক্ত সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে নূর আলী মাতব্বর, মোহাম্মদ মিয়া চৌধুরী, খলিল আহাম্মদ চৌধুরী, নজুমিয়া তালুকদার, নবাব মিয়া, আহসানুজ্জামান চৌধুরী, হাজী আবদুল কাদের, ফতেহ আলী চৌধুরী বাড়ীর আলহাজ্ব সুলতান আহাম্মদ চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য। সকলের পরামর্শক্রমে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ চূড়ান্ত করা হয়। ১৯৩৬ সালের মার্চের কোন একদিনে মাদ্রাসার ভিত্তি স্থাপন করা হয়। এ উপলক্ষে এক বিরাট ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। উক্ত মাহফিলে আমিনুল হক চৌধুরীর পীর তৎকালীন চট্টগ্রাম জামে মসজিদের খতিব আওলাদে রাসূল (সাঃ) হযরত গাজী আল্লামা ছৈয়দ আবদুল হামিদ খান বোগদাদী (রাঃ) প্রধান মেহমান হিসেবে উপস্থিত থেকে মাদ্রাসার ভিত্তি স্থাপন করেন। উক্ত মাহফিলে এলাকার অনেক লোকের সমাগম হয়েছিল। আলহাজ্ব আমিনুল হক চৌধুরীর নিজস্ব জমিতে এবং ফতেহ আলী চৌধুরীর দীঘির উত্তর পাড়ের কিছু অংশ নিয়ে হাফেজ বজলুর রহমান (রঃ) সড়কের পাশ ঘেঁষে গড়ে উঠা উক্ত মাদ্রাসার ভিত্তিস্থাপনের সময় আল্লামা গাজী ছৈয়দ বোগদাদী সকলের উদ্দেশ্য করে বলেন-

"ইছ্ মাদ্রাসা-কো-মেরী নাম পর রাখো!

তা কিয়ামত ইয়ে মাদ্রাসা জারী রহেগা"।

অর্থাৎ এই মাদ্রাসা আমার নামানুসারে হামিদিয়া নামকরণ করিও, তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত উক্ত মাদ্রাসা চলতে থাকবে। ইন্‌শাআল্লাহ কোন শক্তি এটি বন্ধ করতে পারবে না।

ভিত্তিস্থাপনের পর পর মাদ্রাসার কার্যক্রম শুরু হয়। আলহাজ্ব আমিনুল হক চৌধুরীর ইচ্ছে ছিল এই মাদ্রাসাকে একটি ইসলামী কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলবেন। কারণ গ্রামের বেকার লোকজন ও ছাত্রদের কারিগরি শিক্ষা দিয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তাই তিনি মাদ্রাসার এক পার্শ্বে উইবিং শিল্প স্থাপন করেন। ছাত্রদের লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে ও দরিদ্র গ্রামবাসীদের উইবিং শিল্পে শিক্ষা দিতেন। তিনি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পর বিভিন্ন এলাকা হতে আগত ছাত্র, এতিম ও শিক্ষকদের নিজ বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। কারণ প্রায় ৬৫ বছর আগে এলাকায় টিউশনির তেমন ব্যবস্থা ছিল না। তাঁর অর্থানুকুল্যে এবং এলাকাবাসীর সাহায্য সহযোগিতায় মাদ্রাসার লেখাপড়ার কর্মক্রম চলতে থাকে। মাদ্রাসার প্রথম সুপারের দায়িত্বে ছিলেন আমীর পাড়ার মওলানা ওবাইদুল হক।

প্রথম অবস্থায় মাদ্রাসাটি ছিল ছনের ছাউনি। ক্রমান্বয়ে এলাকার জনগণের সাহায্যে টিনের ছাউনি হয়। ১৯৫১ সালে ১৬ ডিসেম্বর মাদ্রাসাটি পূর্ব পাকিস্তান, সরকার আমলে আলহাজ্ব বদিউল আলম চৌধুরীর (বি.কম অনার্স) সহযোগিতায় দাখিল ও আলিম মাদ্রাসা হিসেবে মঞ্জুরী লাভ করে। ১৯৫২ সাল থেকে দাখিল, আলিম বোর্ড পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ছাত্ররা কৃতিত্বের সাথে ভাল ফলাফল করে আসছে। আলহাজ্ব আমিনুল হক চৌধুরী ১৯৫৪ সালে ইন্তেকাল করার পর তাঁর স্থলে পর্যায়ক্রমে মরহুম আলহাজ্ব সুলতান আহাম্মদ চৌধুরী এবং এমদাদ হোসেন চৌধুরী মাদ্রাসার দেখা শুনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পুরাতন সদস্যদের মধ্যে অনেকেই ইন্তেকাল করলে ডাঃ আবদুল হাদী (সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান) আবদুল মোতালেব শাহ, আমিনুল্লাহ কেরানী আরো অনেকে পরিচালনা কমিটির নতুন সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হন।

সুলতান আহাম্মদ চৌধুরী ইন্তেকাল করলে তাঁর জৈষ্ঠাপুত্র আলহাজ্ব বদিউল আলম চৌধুরী সেক্রেটারী পদে এবং এমদাদ হোসেন চৌধুরী (সাবেক চেয়ারম্যান) সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হন।

আলহাজ্ব বদিউল আলম দায়িত্ব পালনকালে মাদ্রাসার ভবন নির্মাণে সরকারী অনুদান পাওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন এবং আমিনুল হক চৌধুরীর স্ত্রী মোস্তাফা খাতুন চৌধুরীর আর্থিক সহযোগিতায় মাদ্রাসার দ্বিতল ভবন নির্মিত হয়। পরবর্তীতে উক্ত ভবনটি তাঁর নামে উৎসর্গ করা হয়।

মাদ্রাসায় যখন ধীরে ধীরে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি হতে লাগল, তখন মরহুম নবাব মিঞা চৌধুরী মাদ্রাসার পশ্চিমাংশে রাস্তার পাশ্বে ১০ গন্ডা জমি মাদ্রাসার নামে দান করেন। মাদ্রাসার মঞ্জুরী বহাল রাখার জন্য মরহুম সুলতান আহাম্মদ চৌধুরী মরহুম সিরাজুল হক চৌধুরী, মরহুম ফজলুল হক চৌধুরী, ২.৯৯ শতক খিলা ও নাল জমি মাদ্রাসার নামে দান করেছিলেন। দীর্ঘদিন যাবৎ আলিম পর্যায়ে প্রশাসনিক কার্যক্রম অতিবাহিত হওয়ার পর ১৯৭৫ সালে সরকার ফাজিল পর্যন্ত কার্যক্রম চালানোর অনুমতি দান করে। অনুমতিক্রমে ২ বছর পরীক্ষা দেওয়ার পর ১৯৭৭ সালে সরাসরি ফাজিল মঞ্জুরী লাভ করে। বর্তমান পর্যন্ত তা' বহাল রয়েছে।

অন্যদিকে আলহাজ্ব বদিউল আলম চৌধুরী পারিবারিক কারণে ঢাকায় চলে যাওয়ার পর মরহুম শাহ আলম চৌধুরী সেক্রেটারী পদে অধিষ্ঠিত হন। এই মাদ্রাসার প্রাক্তন সদস্যদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন তাদের মধ্যে মরহুম শামসুল হুদা চৌধুরী (চেয়ারম্যান), সামশুল হুদা চৌধুরী (হায়দার), মরহুম সাহাদাত আলম চৌধুরী (সাধু), আলহাজ্ব এজাহারুল হক চৌধুরী উল্লেখযোগ্য। মরহুম সফিক উদ্দীন চৌধুরীও কিছুদিন সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে অধ্যাপক মোজাহেদুল ইসলাম চৌধুরী সভাপতি ও রফিক আহমেদ চৌধুরী সেক্রেটারী পদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

১৯৭৬ সালে এমদাদ হোসেন চৌধুরী ইন্তেকালের পর আলহাজ্ব ছৈয়দ মোঃ শফি অদ্যবদি মাদ্রাসার সহ-সভাপতি ও পৃষ্ঠপোষক হিসাবে বহাল রয়েছেন। মূলতঃ বর্তমানে মাদ্রাসার বিভিন্ন সমস্যা সমাধান ও আর্থিকভাবে ছৈয়দ মোহাম্মদ শফির অবদান রয়েছে । গভর্ণিং বডির ১৩ জন সদস্য মাদ্রাসার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্বে আছেন। আলহাজ্ব ছৈয়দ মোহাম্মদ শফি মাদ্রাসার এতিমখানার ভবন নির্মাণে ৭ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করেন। মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পর হতে অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন- মরহুম মৌলানা ওবাইদুল হক, মরহুম মৌলানা গোলামুর রহমান, হাফেজ মৌলানা আবদুল কাদের, মরহুম মৌলানা নুরুল আমিন, মরহুম মৌলানা এয়াকুব, মরহুম মৌলানা আলহাজ্ব হাফিজুব রহমান উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে মৌলানা জহুর আহাম্মদ অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

বিগত দিনে মাদ্রাসার উন্নয়নে যাঁরা বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা দিয়েছেন তাদের মধ্যে বিচারপতি আবদুল কুদ্দুস চৌধুবী, সাবেক মন্ত্রী জিয়াউদ্দীন আহম্মেদ বাবলুর অবদানও উল্লেখযোগ্য।

আরো অনেকের দানকৃত চাঁদা, জাকাত, ফিতরা ইত্যাদি বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতায় বর্তমানে মদ্রাসা পরিচালিত হচ্ছে। মাদ্রাসার সব দলিলপত্র সংরক্ষণ করা হয়নি বলে অনেকের নাম হয়তো ভুলবশত: বাদ পড়তে পারে। তাই সকলের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যাঁরা মাদ্রাসা উন্নয়নে বিভিন্নভাবে জড়িত থেকে ইন্তেকাল করেছেন তাঁদের আত্মার মাগফেরাত ও জান্নাত কামনা করছি।

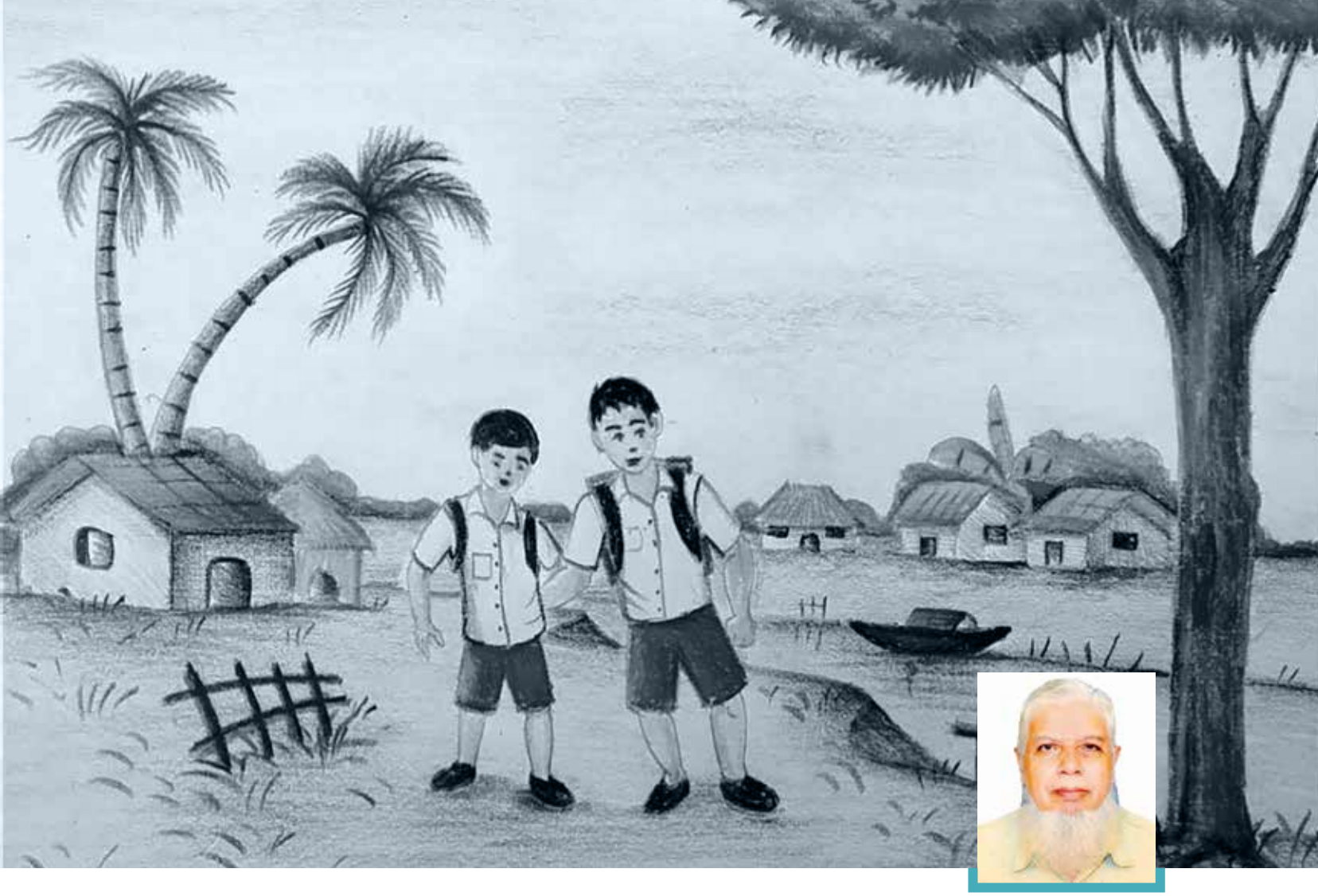

পরিকল্পিত ছাত্র জীবনের রূপরেখা

অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী চৌধুরী

১৯৭৩ সালের প্রথম দিকে নিজামপুর কলেজের রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ লাভ করি। ১৯৭৬ সালে আমাকে নিজামপুর কলেজ ছাত্রাবাসের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিয়োগ দান করে। তখন বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক পরীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে কঠোর সরকারী নিয়ন্ত্রণ ছিল। তাই পরীক্ষা পাশের হারও সন্তোষজনক ছিল না। এমন অবস্থায় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভাল ফল লাভের উপায় খুঁজে বের করার চেতনাবোধ খুবই জোড়ালো হতে থাকে। তাই ছাত্রছাত্রীরা নানা প্রকার প্রশ্ন নিয়ে শিক্ষকদের শরণাপন্ন হতে বাধ্য হতো। ছাত্রাবাসের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে আমাকে নিয়মিত ছাত্রাবাস পরিদর্শন করতে হয়। তাই আমার নিকট ছাত্রাবাসের ছাত্রগণ নিয়মিত যোগাযোগ করতে লাগল। এক পর্যায়ে ১৯৭৬ সালের প্রধমদিকে ছাত্রাবাসের ছাত্রদের নিকট বিজ্ঞপ্তি আকারে জানানো হলো যে, "পরিকল্পিত ছাত্রজীবন কর্মসূচী নামে একটি কর্মসূচীঃ প্রণয়ন করা হয়েছে। ছাত্রাবাস তত্ত্বাবধায়ক "প্রকল্প পরিচালকের" দায়িত্ব পালন করবেন। উক্ত কর্মসূচী যারা অনুসরণ করতে উচ্ছুক, তাদের নাম ঠিকানা প্রকল্প পরিচালকের নিকট প্রদান করতে হবে। উক্ত কর্মসূচীর খবর প্রকাশিত হওয়ার পর কলেজের সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের একটা অংশ কর্মসূচীতে অংশ করার প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করল। অবশেষে তাদের প্রস্তাব মেনে নেওয়া হলো।

উক্ত কর্মসূচী মূলত একটি শিক্ষামূলক আন্দোলন ও প্রতিযোগিতাধর্মী কর্মসূচী। উক্ত শিক্ষাসংক্রান্ত প্রতিযোগিতাকে সাধারণত ১০০০ নম্বর অর্জনের প্রতিযোগিতা হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। নিম্নে উক্ত প্রতিযোগিতার জন্য নির্বাচিত বিষয়ের বিবরণ প্রদান করা হলো ঃ-

ক্রমিক নম্বর	কর্মসূচীর জন্য নির্বাচিত বিষয়সমূহ	মানবন্টন
১.	শিক্ষাবর্ষের কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত পরিকল্পনা প্রকল্প পরিচালকের নিকট জমা দান করা	১১৫
২.	দৈনিক ও সাপ্তাহিক কার্যক্রমের প্রস্তাবিত ও অর্জিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা এবং তাহা যথাসময়ে প্রকল্প পরিচালকের নিকট পেশ করা	১২৫
৩.	শিক্ষাবর্ষের তিনটি অধ্যায়ের তিনটি রুটিনের কপি প্রকল্প পরিচালকের নিকট জমাদান করতে হবে। প্রথম বর্ষ প্রথম অধ্যায়, দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় অধ্যায় এবং কোচিং পিরিয়ড তৃতীয় অধ্যায় হিসেবে গণ্য হবে।	১৩০
৪.	বিভিন্ন খেলাধূলা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করা, খেলার নিয়ম সম্বন্ধে অবহিত হওয়া এবং উক্ত বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করা। (যেকোন তিনটি)	২০
৫.	বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করা অথবা প্রাথমিক ধারণা লাভ করা এবং প্রবন্ধ রচনা করা। (তিনটি)	১৫
৬.	উপার্জন করে বিদ্যার্জন (বিবরণ প্রদান)	১৫
৭.	সাহিত্য চর্চা, সাহিত্য ও শিল্প সংক্রান্ত কর্মসূচী গ্রহণ এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করা (সনদ অথবা বিবরণ প্রদান করা)	২০
৮.	যে কোন তিন প্রকারের অনুশীলনের গুরুত্ব ও পদ্ধতি সম্বন্ধে রচনা করা এবং উক্ত প্রবন্ধসমূহের একটা কপি প্রকল্প পরিচালকের নিকট জমা দিতে হবে। বিষয়সমূহ নিম্নরূপ:- (ক) ধর্মীয় অনুশীলন (নামাজ) বা অন্য বিষয় (খ) শরীর চর্চা সংক্রান্ত অনুশীলন (গ) সৎ অভ্যাস	৩০
৯.	যে কোন একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মপদ্ধতি সম্মন্ধে ধারণা লাভ করা এবং ধারণার আলোকে প্রতিবেদন প্রণয়ন করা ও পেশ করা	৩০
১০.	শিক্ষা সফর অথবা বনভোজনের আয়োজন করা এবং অভিজ্ঞতার বিবরণ পেশ করা	৩০
১১.	যে কোন একটি জাতীয় সমস্যাসমূহ আলোচনার আয়োজন করা ও আলোচনার বিবরণ পেশ করা অথবা, সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা এবং ইহার বিবরণ পেশ করা	৩০
১২.	যে কোন প্রকল্প গ্রহণ করা বা চলমান প্রকল্পে অংশগ্রহণ করা অথবা মূল্যায়ণ প্রতিবেদন পেশ করা (দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প বা অনুরূপ অন্য প্রকল্প)	৩০
১৩.	নিয়মিত ক্লাশে উপস্থিত থাকা এবং সাত দিনের ক্লাশ রিপোর্ট পেশ করা	৬০
১৪.	কলেজ লাইব্রেরীতে নিয়মিত বই পড়া।	৩০
১৫.	বিভিন্ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা	২০০
১৬.	ছাত্রজীবনের লক্ষ্য অর্জন সংক্রান্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করা। কর্মশালার প্রতিবেদন পেশ করা (অন্য পৃষ্ঠায় ইহার উপর একটি ধারণা প্রদান করা হবে)	৩০

ক্রমিক নম্বর	কর্মসূচীর জন্য নির্বাচিত বিষয়সমূহ	মানবন্টন
১৭.	পরিচায়ক কোর্স বা প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করা (বৃত্তিমূলক নয়) বা বিদেশী ভাষা শেখা, রোভার স্কাউট, বি,এন,সি,সি ইত্যাদি।	২০
১৮.	সপ্তাহ পালন করা এবং প্রতিবেদন পেশ করা শিক্ষা সপ্তাহ, পরিচ্ছন্ন সপ্তাহ ইত্যাদি।	২০
১৯.	পরিকল্পিত ছাত্রজীবন সংক্রান্ত পরিচায়ক কোর্সে অংশগ্রহণ করা	২০
১৯.	প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকো ১৩টি কোর্ট ফাইল সংগ্রহ করতে হবে। প্রতিটি পত্রের জন্য একটি কওে মোট ১২টি এবং সাধারণ ফাইল থাকবে একটি। নিম্নোক্ত বিষয়গুলি উক্ত ফাইল সমূহে থাকবে। যথা ঃ (১) তিন বৎসরের চূড়ান্ত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র (২) প্রতিটি পত্রের পাঠ্যসূচি বা সিলেবাস। (৩) বিষয় শিক্ষকের নিকট থেকে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের তালিকা (৪) গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তরের আলোকে প্রতিটি পত্রের জন্য কমপক্ষে ১০টি "নোট" প্রস্তুত করতে হবে। উক্ত ক্ষেত্রে শিক্ষকের সহযোগিতা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। (৫) সাধারণ রুটির সমূহ এবং শিক্ষাবর্ষেও পরিকল্পনার কপি থাকবে । প্রতি সপ্তাহে একবার ফাইলগুলিতে সংরক্ষিত বিষয়সমূহ দেখতে হবে।	২০

উপরোক্তা বিষয়গুলির প্রতি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে তিনটি স্টাইপেন্ড এবং "পরিকল্পিত ছাত্র" এই মর্মে সনদ প্রদানের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। ইহার ফলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উপরোক্ত রূপরেখার আলোকে কাজ করার প্রবল আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। উক্ত কারণে উক্ত কর্মসূচী একটি সফল প্রকল্প হিসেবে পরিগণিত হয়।

পরিকল্পিত ছাত্রজীবন কর্মসূচী হঠাৎ পাওয়া কোন মনগড়া কর্মসূচী নয়। শিক্ষা মনোবিজ্ঞান নিয়ে যারা কিছু কাজ করেছে তাদের চিন্তার কিছু প্রভাব পরিকল্পিত ছাত্রজীবন কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে। নিম্নে উক্ত বিষয়ে কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করব। প্রথমে আমেরিকার শিক্ষা মনোবিজ্ঞানী পার্ক হাষ্টের কথা এসে যায়। তিনি আমেরিকায় 'ডালটন' শহরে এক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে তাহার শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করেন। ইহা "ডালটন পরিকল্পনা" হিসেবে পরিচিত লাভ করে। তাহার পরিকল্পনা চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। এর ফলশ্রুতি হিসেবে তিনি ভারতে দুইটি স্কুলে তাহার শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচী চালু করেন। যার একটি দক্ষিণ ভারতের একটি স্কুলে অন্যটি সিলেটের সিলেট সরকারী হাইস্কুলে। উক্ত কর্মসূচীর মূল বক্তব্য হচ্ছে "ইউনিট এসাইনমেন্ট" ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার বিষয়গুলিকে ছোট ছোট ইউনিটে ভাগ করে কার্যকর বিভাজন পদ্ধতি কার্যকর করা। মনোবিজ্ঞানি 'কালটন 'উনেটকা' পরিকল্পনা নামে একটি শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। তিনি ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে "দল গঠন" করে দলভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এইচ,সি,মরিসন একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। ইহা মরিসন পরিকল্পনা নামে পরিচিতি লাভ করে। ডাল্টন পরিকল্পনার সাথে অনেক ক্ষেত্রে ইহার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ডিক্রোলি একটি শিক্ষা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। তাহার পদ্ধতির সাথে জীবন ও জীবিকার কথাও জড়িত তাই পরিকল্পিত ছাত্রজীবন কর্মসূচীর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে বৃত্তিমূলক তিনটি বিষয় সম্বন্ধে ধারণা লাভ করতে হবে। উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে পরিকল্পিত ছাত্রজীবন কর্মসূচীর একটি পটভূমি পাওয়া গেল।

পরিকল্পিত ছাত্রজীবন কর্মসূচী সম্বন্ধে পর্যালোচনা

উক্ত কর্মসূচী ১৯৭৬ সালে শুরু হয়। দুই বৎসর ইহার কার্যক্রম বন্ধ ছিল। ১৯৯২ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। তাই এক কথায় বলা যায় প্রায় ১৫ বৎসর পরিকল্পিত ছাত্রজীবন কর্মসূচী খুবই ফলদায়ক অবস্থানে ছিল। উক্ত ১৫ বৎসরে বোর্ডের পরীক্ষায় ১৬ জন ছাত্র/ছাত্রী বোর্ডের মেধা তালিকায় স্থান লাভ করে। তবে উক্ত কর্মসূচীর সাথে যুক্ত ছিল না এমন ৯ জন ছাত্র/ছাত্রী মেধা তালিকায় স্থান লাভ করে। আরও একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, পরিকল্পিত ছাত্রজীবন কর্মসূচীতে যোগদানকারী প্রত্যেকটি ছাত্র/ছাত্রী উক্ত প্রকল্পের শত

ভাগ কার্যক্রম অনুসরণ করেনি। তাই "পরিকল্পিত ছাত্র" শীর্ষক যে সনদ কলেজের পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়েছে তাহা প্রত্যেক বৎসর গড়ে ১৬ জনের বেশী হবেনা। তাই পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ১৬ বৎসরে ২৪০ জন ছাত্র/ছাত্রী পরিকল্পিত ছাত্র/ছাত্রী শীর্ষক সাফল্যে-সনদ লাভ করেছে। তাই ঐ ২৪০ জন ছাত্র/ছাত্রী বাস্তব জীবনে কতটুকু সফল হয়েছে এর কোন তথ্য আমাদের হাতে নেই। সকলের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার সহজ কোন ব্যবস্থাও আমাদের হাতে নেই। তাই উক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে কোন তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তবে পরিকল্পিত ছাত্রজীবন কর্মসূচীর এক সফল প্রাক্তন ছাত্র ডঃ মোহাম্মদ আবু ইউসুপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক বর্তমানে অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব প্রত্যেক বৎসর চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে তার শিক্ষকদের উপলক্ষে এক ডিনারের আয়োজন করে থাকে (তবে করোনার কারণে বিগত দুই বৎসর বন্ধ রয়েছে)। বিগত ২০১৯ সালের ডিনার অনুষ্ঠানে আমাদের কিছু সফল ছাত্র/ছাত্রীর তথ্য পেয়েছি। তাহা নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো ঃ- একজন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদের ডীন, ৩ জন পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করে, ৮ জন সরকারী কলেজের শিক্ষক, ১০ জন বেসরকারী কলেজের শিক্ষক, ৩ জন বেসরকারী কলেজের অধ্যক্ষ, ১ জন সরকারী কলেজের উপাধ্যক্ষ, ২ জন হাই স্কুলের হেড মাষ্টার, ১ জন সফল ব্যবসায়ী, ২ জন অর্থ মন্ত্রণালয়ের অডিট ও হিসাব শাখায় সিনিয়র অফিসার, ডাক্তারী পেশায় আছে তিন জন। প্রকৌশলী ১ জন, ব্যাংকের ভিপি ২ জন, ব্যাংক ম্যানেজার ২ জন, পুলিশ অফিসার ২ জন, লেঃ কর্ণেল ১ জন বর্তমানে, ফ্রান্স, অষ্টেলিয়া এবং কানাডায় আছে ৩ জন। লন্ডনে আছে ২ জন, হিসাব রক্ষক ১ জন। সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার পল্লী বিদ্যুৎ ১ জন। মাইডাসের সিনিয়র অফিসার ১ জন। ২৪০ জন সফল ছাত্র/ছাত্রীর মধ্যে ৫৬ জনের অবস্থান জানতে পেরেছি। যে তথ্য আমরা পেয়েছি, এক কথায় বলা যায় সকলে সম্মানজনক অবস্থানে রয়েছে। পরিশেষে বলা যায় ছাত্রজীবনই হচ্ছে ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি ক্ষেত্র।





নন্দিত বিসিএস পরিবার ও কল্যাণ ট্রাস্টের অন্তর্নিহীত ভাবনা

সাধন কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী
অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক

মানুষ যায়, নাম থাকে-

কাল যায়, স্মৃতি থাকে ॥

গুণী শিক্ষক মৌলানা নুরুল আলম চৌধুরী ও রত্নগর্ভা মা খালেদা বেগম চৌধুরী আজ আমাদের মধ্যে নেই- তাঁরা জান্নাতবাসী। মৌলানা সাহেব ছিলেন শিক্ষা, শিক্ষকতা, জীবনাদর্শ ও আধ্যাত্মিকতার উজ্জ্বল উদাহরন। উন্নতর ও মহত্তর জীবনে উত্তীর্ণ হতে চাইলে প্রকৃত শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। রত্নগর্ভা মায়ের সাধনা ছেলেমেয়েদের প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে মনুষ্যত্ব জাগরণে পরিবার ও সমাজের ভবিষ্যৎ বংশধরদের আধুনিক শিক্ষায় আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। এই ঐতিহ্যবাহী ও আলোকিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তাঁদের ৩ ছেলে ও ২ মেয়ে। উল্লেখ্য, তিন সহোদরই বিসিএস ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তা। এ অঞ্চলে আর কোন পরিবারে পর পর তিনজন বিসিএস ক্যাডারভূক্ত আছে কিনা আমার জানা নেই।

বড়ছেলে জনাব মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সিএজি হিসেবে নিয়োজিত আছেন। তিনি সরকারের কত গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে দায়িত্ব পালনে সততা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা' বর্ণনাতীত। মেজছেলে মু. মোহসিন চৌধুরী বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে নিয়োজিত আছেন। তিনিও বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। সেজছেলে মোজাহেদুল ইসলাম চৌধুরী বর্তমানে চট্টগ্রাম সরকারী কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োজিত আছেন। তিনিও শিক্ষা ক্ষেত্রে বহু অবদান রেখেছেন। উনাদের দুই মেয়েও উচ্চ শিক্ষার শিক্ষিত, একজন চট্টগ্রাম শহরের বহদ্দারহাটস্থ এখলাছুর রহমান সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে অবসরে গেছেন। শিক্ষকতায় নিয়োজিত। এলাকায় উক্ত পরিবার বিসিএস পরিবার নামে খ্যাত। আমিও তাঁদের একজন অতি সাধারণ শিক্ষক হিসেবে থাকতে পেরে নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান বলে মনে করছি।

তাঁদের ঐতিহ্যবাহী পরিবারের সুখ্যাতি সবটুকু তুলে ধরা স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। কারণ শব্দের সীমাবদ্ধতা রয়েছে, আমারও অক্ষমতা রয়েছে। তাঁদের বাড়ীর সামনে রয়েছে ৪০০ বছরের পুরাতন মসজিদ ও বিশাল এক দীঘি। দীঘির পাড়ে রয়েছে কদলপুর ফাজিল মাদ্রাসা, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, সরকারী হাসপাতাল, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের শাখা, আশরাফ আলী চৌধুরী হাট- যা' এককালের জমিদার বাড়ীর ঐতিহ্য। বিসিএস পরিবারের বর্তমান কর্ণধার মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী ১৯৯০ সনে কদলপুর উচ্চ বিদ্যালয় প্রাক্তন ছাত্র সমিতি গঠন করেন। তিনি শত ব্যস্ততার মধ্যেও নিজে সময়ে সময়ে বিদ্যালয়ের ক্লাস নিতে আসতেন এবং শিক্ষার্থীদের উৎসাহ প্রদান করতেন। প্রাক্তন ছাত্র-সমিতি এত শক্তিশালী যে, বিদ্যালয় থেকে যে সকল ছাত্র-ছাত্রী কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত বা যাঁরা বিদেশে আছেন তাঁদেরকে সম্পৃক্ত করে সংগঠনটি বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী কাজে অংশগ্রহণ করে যাচ্ছে। ১৯৯২ সালে কদলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী ও ২০১৮ সালে বিদ্যালয়ে সুবর্ণ জয়ন্তী মহাসমারোহে উদ্‌যাপন করে এলাকায় উদ্দীপনা সৃষ্টি করে।

রাউজানের সম্মানিত সংসদ সদস্য ও রেল মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটির সভাপতি স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত জনাব এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরী, যিনি রাউজানকে যোগাযোগ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য উৎপাদন ও বাসস্থানের ব্যবস্থাসহ নানা উন্নয়নের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তাঁর সাথে এই এলাকার বিসিএস পরিবারের সদস্যরা সম্পৃক্ত হয়ে কদলপুর উচ্চ বিদ্যালয়কে কলেজে উন্নীত করে ৪-তলা বিশিষ্ট ৪টি নূতন আধুনিক ভবন নির্মাণের ব্যবস্থা করে কদলপুর গ্রামকে শিক্ষাক্ষেত্রে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এছাড়াও কদলপুর আইডিয়াল হাই স্কুল, মসজিদ-মন্দিরের উন্নয়নসহ এলাকার রাস্তাঘাটের উন্নয়নে তাঁদের সার্বিক সহযোগিতা রয়েছে। তাঁরা তাঁদের পিতামাতার আদর্শের স্মরণে 'নুরুল আলম চৌধুরী-খালেদা বেগম কল্যাণ ট্রাস্ট' গঠন করে অত্র জনপদের সার্বিক উন্নয়ন ধারা অব্যাহত রাখার দীপ্ত অঙ্গীকার পূনঃ ব্যক্ত করেছেন।

নুরুল আলম চৌধুরী ও খালেদা বেগম চৌধুরী কল্যাণ ট্রাস্টের কাছে এলাকাবাসীর প্রতীতি -

শিক্ষা প্রসারে উক্ত ট্রাস্টের সদস্যরা কদলপুর গ্রামে অনেক আগে থেকে চেতনার বাতিঘর হিসেবে অসাধারণ কাজ করে যাচ্ছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি, এই কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে তাঁরা সমাজে বরেণ্য ব্যক্তি হিসেবে চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন।

এ জ্ঞানলব্ধ সমৃদ্ধ পরিবারের সদস্যদের কাছে আমি একজন নগন্য শিক্ষক হিসেবে আমার প্রত্যাশা-

১। কদলপুর গ্রামে একটি "সার্বজনীন পাঠাগার" নির্মাণ।

২। সংস্কৃতি চর্চার জন্য একটি আধুনিক "কালচারেল ইনস্টিটিউট" গড়ে তোলা।

৩। শরীরচর্চা ও খেলাধুলা উন্নয়নের জন্য ভালো প্রশিক্ষকের ব্যবস্থা করা।

বিসিএস পরিবার এ পর্যন্ত সমস্ত রাউজানসহ কদলপুর এলাকার জন্য যে উন্নয়নমূলক কাজগুলো করেছেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে বহুল প্রশংসার দাবীদার। তাঁরা অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্দীপ্ত-নিবিষ্ট। তাঁদের পরিবারের সকল সদস্যের কল্যাণ ও ট্রাস্টের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।



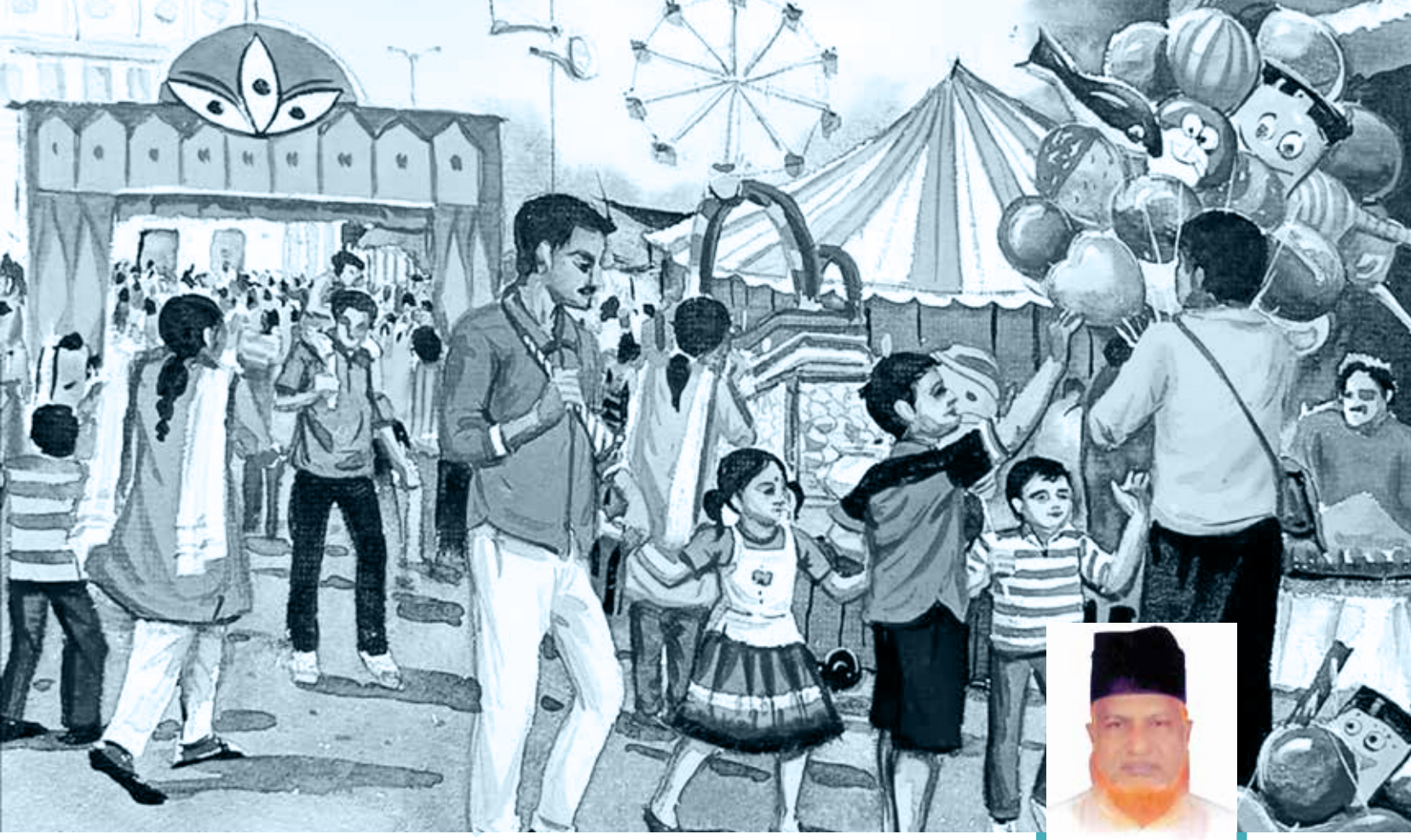

কদলপুরে ঐতিহ্যবাহী স্মরণীয় পরিবার

হাফেজ মোহাম্মদ আবু জাফর ছিদ্দিকী
অধ্যক্ষ ও সচিব, কদলপুর হামিদিয়া ফাযিল ডিগ্রী মাদ্রাসা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য যাঁর নির্দেশে সমগ্র সৃষ্টি জগৎ পরিচালিত। বিশ্বনবী রাসুলে আরবী জনাবে আহমদ মোস্তফা মোহাম্মদ মোজতবা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর লাখো - কোটি দুরুদ ও ছালাম পেশ করছি।

নুরুল আলম চৌধুরী-খালেদা বেগম কল্যাণ ট্রাস্ট একটি স্বরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করাকে আন্তরিক মোবারকবাদ ও স্বাগত জানাই। মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরানে বলেন "ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহি আতকাকুম" অর্থ- নিশ্চয় আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে অধিক সম্মানিত সেই, যে তোমাদের মধ্যে অধিক খোদাভীরু (সুরা: হুজরাত-আয়াত: ১৩)। বিশ্বনবী সাল্লালাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একদা তাকওয়ার বয়ান দিলে এক জন সাহাবী নবীজির নিকট আরজ করলেন তাকওয়া কোথায় থাকে? তখন বিশ্বনবী রাসুলে আরবী বলেন- বক্ষের দিকে ইশারা দিয়ে তাকওয়া এখানে থাকে তথা খোদাভীতিটা মানুষের বক্ষে থাকে। কদলপুর হামিদিয়া ফাযিল ডিগ্রী মাদ্রাসায় খেদমতে আমি অদম একুশ বছর পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে রয়েছি এবং আমার দেখা ও জানামতে নিম্নে তথ্যাবলী পেশ করছি।

রাউজানের মধ্যে কদলপুর একটি ঐতিহ্যবাহী প্রসিদ্ধ ইউনিয়ন। যেখানে অনেক বড় বড় আল্লাহর মকবুল অলি রয়েছে এবং দেশখ্যাত গুনীজ্ঞানীর জন্মভূমি ও বাসস্থান, স্মৃতি বিজড়িত বাড়ীঘর রয়েছে। বহু প্রাচীনকাল থেকে মধ্যম কদলপুরের ফতেহ আলী চৌধুরী বাড়ীর সুখ্যাতি রয়েছে। শ্রদ্ধেয় আলহাজ্ব মরহুম মাওলানা নুরুল আলম চৌধুরী একজন অন্যতম গুনীজ্ঞানী আদর্শবান শিক্ষক ছিলেন। আজীবন তিনি শিক্ষকতার মহান পেশায় নিয়োজিত ছিলেন, দ্বীন মাযহাব মিল্লাত জাতির খেদমত আঞ্জাম দিয়ে গেছেন। তিনি একজন খোদাভীরু আবেদ পবিত্র কোরআন মাজিদ অধিক তেলাওয়াত কারী ছিলেন। তিনি ধৈর্য্যশীল বিনয়ী প্রকৃতির ছিলেন। মহান আল্লাহ তায়ালার উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাসও ভরসা ছিল। তিনি একজন সফল অভিভাবক ও আলোকিত পথ প্রদর্শক ছিলেন। তিনি আরো অনেক সৎগুনের অধিকারী ছিলেন।

শ্রদ্ধেয়া খালেদা বেগম একজন মহিয়সী রমনী ছিলেন এবং মরহুম মাওলানা নুরুল আলম চৌধুরীর সহধর্মীনী হিসেবে আবেদা সালেহা ত্যাগী খোদাভীরু মহিলা ছিলেন। তিনিও একজন আদর্শবান অভিভাবক ছিলেন।

শ্রদ্ধেয় আলহাজ্ব মাওলানা নুরুল আলম চৌধুরী ও খালেদা বেগম তাদের পূর্ব পুরুষ জ্ঞানীগুনী কীর্তিমান ধার্মিক খোদাভীরু পরোপকারী মাযহাব মিল্লাতের সেবক ছিলেন। শ্রদ্ধেয় খালেদা বেগমের বাবা আল্লামা আবদুল হক সাহেব (র:) উচু পর্যায়ের আলেম ও বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁরও অনেক সুখ্যাতি রয়েছে। তাঁরা সকলে সহীহ ঈমান আক্বিদা আমলের মাধ্যমে মহানবী (দ:) ও মহান আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছেন।

শ্রদ্ধেয় আলহাজ্ব মাওলানা নুরুল আলম চৌধুরী ও খালেদা বেগম দু'জনই কীর্তিমান ও আদর্শবান ছিলেন। তাঁদের ইবাদত রিয়াজত ও দোয়ার ফলে ছেলে মেয়েরা দেশের মহান পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। শ্রদ্ধেয় আলহাজ্ব মাওলানা নুরুল আলম চৌধুরী বৃদ্ধাবস্থায় পর্যন্ত মাদ্‌রাসা-এতিমখানা ও স্কুল-কলেজের ছাত্রদেরকে শরীয়তের জরুরী মাসায়েল-দোয়া কোরআন তেলোয়াত আরবী অনুবাদসহ ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দিতেন।

শ্রদ্ধেয় আলহাজ্ব মাওলানা নুরুল আলম চৌধুরীর জেঠা শ্রদ্ধেয় আলহাজ্ব আমিনুল হক চৌধুরী (র:) একজন সমাজ সংস্কারক দানশীল আশেকে রাসুল ও মহান আল্লাহর অলি ছিলেন। শ্রদ্ধেয় আলহাজ্ব আমিনুল হক চৌধুরী (র:) ধন সম্পদ সবকিছু আল্লাহ ও রাসুলের সন্তুষ্ঠি অর্জন কল্পে আল্লাহর রাস্তায় কোরবানী দিয়েছেন। তিনি আল্লাহ ও রাসুল (দ:) এর ভালবাসায় সর্বদা ইবাদতে মশগুল থাকতেন। তিনি খাঁটি নিয়্যত নিয়ে ১৯৩৬ সনে ঐতিহ্যবাহী কদলপুর হামিদিয়া ফাযিল ডিগ্রী মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরিকত আওলাদে রাসুল (দ:) আল্লামা গাজী সৈয়দ আবদুর হামিদ বোগদাদী (রহ:) এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন।

এলাকার গন্যমান্য ধর্মভীরু ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সার্বিক সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠানটি উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করে। মাদ্‌রাসাটি সরকারি মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ১৯৫৭ সালে দাখিল (এসএসসি) পর্যায়ে স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৭৮ সালে আলিম (এইচএসসি) ও ফাজিল (ডিগ্রী) পর্যায়ে স্বীকৃতি লাভ করে। এবং ০১.০১.১৯৮০ইং হতে সরকারিভাবে এমপিও ভুক্ত হয়। অত্র মাদ্‌রাসায় আলহাজ্ব আমিনুল হক চৌধুরী এতিমখানাটি ২০০৫ সালে সরকারি নিবন্ধনকৃত ও ক্যাপিটেশন গ্রান্টপ্রাপ্ত হয়। ২০২১ সাল হতে আলহাজ্ব নুরুল আলম চৌধুরী তাজবীদুল কোরান হেফজখানা ও নুরানী শিক্ষা বিভাগটি নুরুল আলম চৌধুরী- খালেদা বেগম কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক চালু করা হয়েছে। অত্র মাদ্‌রাসায় ২৩ জন শিক্ষক ৭ জন কর্মচারী ও ৯৫০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে।

প্রতিষ্ঠাকাল ঃ কদলপুর হামিদিয়া ফাযিল ডিগ্রী মাদ্‌রাসাটি ১৯৩৬ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বর্তমানে কদলপুর হামিদিয়া ফাযিল ডিগ্রী মাদ্‌রাসার লেখা পড়ার মান ও ফলাফল সন্তোষজনক। বিগত তিন বছরের পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা করলে তা' অনুধাবন করা যায়, যার বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ

পরীক্ষার সাল	পাশের হার				
	ইবতেদায়ী	জেডিসি	দাখিল	আলিম	ফাযিল
২০১৭	৯২%	১০০%	৯৫%	৬৭.৫৬%	১০০%
২০১৮	৯৪%	১০০%	৮৯%,	৮৯%	১০০%
২০১৯	৮৬.৮৪%	৯৮.৭২%	৯২.৮৬%	৯৪.২৯%	১০০%

আলহাজ্ব নুরুল আলম চৌধুরী তাজবীদুল কোরান হেফজখানা ও নুরানী মাদ্‌রাসার লেখাপড়ার মানও ভাল। তবে আধুনিক রূপরেখা ও গুণগত মনোন্নয়নের জন্য চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ইনশাল্লা আল্লাহ তায়ালা তা আরো উত্তরোত্তর এগিয়ে যাবে।

শ্রদ্ধেয় আলহাজ্ব মাওলানা নুরুল আলম চৌধুরী সাহেব জীবদ্দশায় কদলপুর হামিদিয়া ফাযিল ডিগ্রী মাদ্‌রাসার সার্বিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানে আনন্দ পেতেন। বস্তুত তিনি একজন আশেকে রাসুল ছিলেন। সর্বদিক দিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলে প্রমাণিত হয় তিনি একজন সাধক ও আল্লাহর অলি ছিলেন। তিনি কদলপুর হামিদিয়া ফাযিল ডিগ্রী মাদ্‌রাসায় কামিল (এমএ) বিভাগ খোলার জন্য দোয়া করে গেছেন এবং জীবদ্দশায় মুখে তা' বলেও গেছেন। জীবদ্দশায় যুহতারামা খালেদা বেগম ও কদলপুর হামিদিয়া ফাযিল ডিগ্রী মাদ্‌রাসাকে বেশী ভালবাসতেন। এতিম ছাত্রদেরকে সাধ্যমত খানা প্রদান করতেন। শ্রদ্ধেয় আলহাজ্ব নুরুল আলম চৌধুরী ও খালেদা বেগম দু'জনই দেশের কীর্তিমান গুনীজন ছিলেন।

গবেষণায় দেখা যায় কদলপুর হামিদিয়া ফাযিল ডিগ্রী মাদ্‌রাসাটি দু'জন আল্লাহর অলির স্মৃতি বিজড়িত প্রতিষ্ঠান ফুযুজাত ও বারাকত হাসিলের মরকজ। যথাক্রমে আওলাদে রাসুল (দ:) আল্লামা গাজী সৈয়দ আবদুল হামিদ বোগদাদী (রহ) ও শাহা সুফি আলহাজ্ব আমিনুল হক চৌধুরী (র:) এর রূহানী ফয়েজ প্রাপ্ত শরীয়ত- তরীকতের সঠিক আলেম তৈরীর প্রতিষ্ঠান। অতীতে যাঁরা এ প্রতিষ্ঠানকে মহাব্বত করেছেন, সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তাঁরা কামিয়াব হয়েছেন।

কদলপুর হামিদিয়া ফাযিল ডিগ্রী মাদ্‌রাসা, আলহাজ্ব আমিনুল হক চৌধুরী (রহ:) এতিম খানা, আলহাজ্ব মাওলানা নুরুল আলম চৌধুরী তাজবীদুল কোরান হেফজ খানা ও নুরানী মাদ্‌রাসার সার্বিক উন্নয়ন ও তত্ত্বাবধানে রয়েছেন আধুনিক রাউজানের রূপকার রেলপথ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জননেতা জনাব এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরী এমপি, রাউজানের কৃতি সন্তান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সিএজি জনাব মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী, রাউজানের কৃতি সন্তান বিদ্যুৎ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মু. মোহসিন চৌধুরী। মাদ্‌রাসা পরিচালনা পরিষদের সভাপতি পদে রয়েছেন কদলপুরের কৃতি সন্তান বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর জনাব মোজাহেদুল ইসলাম চৌধুরী, সহ-সভাপতি পদে রয়েছেন সমাজ সেবক ও বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী জনাব রফিক উদ্দিন আহমদ চৌধুরী।

যাঁরা কদলপুর হামিদিয়া ফাযিল ডিগ্রী মাদ্‌রাসাকে আন্তরিক ভালবাসবেন, সার্বিক সহযোগিতা করবেন তারা কামিয়াব হবেন, ইহকাল ও পরকালে এর সুফল ভোগ করবেন ইনশাআল্লাহ।

হে পরম করুনাময় মহান আল্লাহ তায়ালা! আমাদেরকে ভাল কাজ করার তওফিক দিন, বেহুরমতে সায়্যেদিল মোরসালিন, আমিন।

